প্রকাশক :
বি, চট্টোপাধ্যায়
চ্যাটার্জি পাবলিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৫৯

মুদ্রাকর :
এস, চ্যাটার্জি
চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স
৪২এ, মলঙ্গা লেন,
কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়			পৃষ্ঠা

বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলা ভাষার মূল উৎস হইল ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত। খৃষ্টজন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আর্য জাতি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়া এদেশে প্রবেশ করেন। তাহার পর তাঁহারা পশ্চিম পঞ্জাবে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইঁহাদের বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি স্তোত্র রচনা করেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি এগুলি এক গ্রন্থে সংকলিত হয়, ইহার নাম ঋগ্বেদ। এই ঋগ্বেদের ভাষাই বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থও এই ভাষায় রচিত। এই ভাষায় তাঁহারা কাব্য-কাহিনীও লিখিলেন। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি কাব্যকাহিনী লিখিবার ভাষার সংস্কার সাধন করিলেন, নাম হইল তাহার সংস্কৃত।

গ্রন্থ রচনায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইলেও জনসাধারণ যে-ভাষায় কথা বলিতে লাগিল তাহা আর সংস্কৃত রহিল না, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকমুখে পরিবর্তিত হইয়া উহা বিভিন্নরূপ ধারণ করিতে লাগিল। প্রকৃতিপুঞ্জ অর্থাৎ জনসাধারণের কথ্য ভাষাকে বলা হইল প্রাকৃত। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত আঞ্চলিক প্রভাবে কিছু কিছু স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল। এইরূপে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃতের সৃষ্টি হইল। বররুচি ইহার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন, প্রাকৃতে নাটক রচিত হইল। সংস্কৃত নাটকেও প্রাকৃত আপনার স্থান করিয়া লইল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাকৃত ভাষাও নিজের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারিল না, আরও শিথিল হইয়া অপভ্রংশে পরিণত হইল। প্রত্যেক প্রাকৃতেরই

নিজস্ব স্বতন্ত্র অপভ্রংশ হইল। এইরূপ মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে আমাদের বাংলা ভাষার উদ্ভব।

বৈদিক সংস্কৃত কিরূপে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের আধুনিক বাংলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে নিম্নে তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

বৈদিক সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাংলা	আধুনিক বাংলা
কৃষ্ণ	কণ্‌হ	কণ্‌হ	কণ্‌হ, কাহ্ন	কাণু, কানাই
দুহিতা	ধীতা, ধীআ	ধীয়	ঝিঅ	ঝি
গ্রাম	গাম	গাঁব	গাঁও	গাঁ
অষ্টাদশ	অট্‌ঠারহ	অট্‌ঠারহ	আঠারহ	আঠার
ভবতি	হোতি, হোদি	হোই	হোই	হয়
কথয়তি	কথেতি	কহোদি, কহেই	কহই	কহে, কয়

মাগধী প্রাকৃত অপভ্রংশের স্তর পার হইয়া প্রাচীন বাংলা হইতে থাকে খৃষ্টীয় দশম শতকের কাছাকাছি। বিংশ শতাব্দীরই প্রথম দিকে আবিষ্কৃত দুইখানি গ্রন্থে অপভ্রংশঘেষা প্রাচীন বাংলার রূপ ধরা পড়িয়াছে। এই দুই গ্রন্থের নাম **চর্যাপদ** এবং **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**। গ্রন্থ দুইটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে :—

চর্যাপদ—চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্বের গান। রচনাকাল খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি। ভগবান বুদ্ধের নির্দেশ ছিল তাঁহার ধর্মতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায় প্রচার করিতে হইবে। বাঙালী সিদ্ধাচার্যগণ তাই তখনকার বাংলায় এই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। পদগুলির অর্থ সাধারণের বোধগম্য নয়, সাধকের আচরণীয়,—নাম তাই চর্যা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল মহারাজার পুঁথিশালা হইতে এগুলি উদ্ধার করেন। বাংলা পুঁথির নেপালে স্থানান্তরকরণ সম্ভবতঃ তুর্কী অভিযানের ভয়ে।

সিদ্ধাচার্যেরা বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সাধক ছিলেন। এই পদ রচয়িতাদের মধ্যে কাহ্নুপাদ, ভুসুকুপাদ, শান্তিপাদ, চাটিলপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চর্যাপদের ভাষার নাম সন্ধ্যাভাষা অর্থাৎ অস্পষ্ট আলোআঁধারি রহস্যময় ভাষা। ভাষা সাধারণের বোধগম্য না হইলেও সাধারণ লোকেরাও ইহা হইতে কিছুটা আনন্দ যে না পাইতেন তাহা নয়, কারণ পদের উপমা দৃষ্টান্ত প্রভৃতি লওয়া হইয়াছিল সাধারণের সমাজজীবন হইতেই। কোথাও কাপড় বোনার উপমা, কোথাও নদী পারাপার, কোথাও মাছ ধরা, কোথাও চুপড়ি চাঙারি বিক্রয়, কোথাও তুলো ধুনা। সুতরাং পদগুলির মধ্য হইতে সেকালের বাঙালী জীবনের চিত্রও কিছু কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চর্যাপদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহাদের হেঁয়ালি, যেমন—'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅঁ' অর্থাৎ বৃক্ষের তেঁতুল কুমীরে খায়।

অথবা—

এক সো পাদুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥

একটি পদ্মের চৌষট্টি পাপড়ি, তাহাতে চড়িয়া ডোমনী বাছা নৃত্য করে।

হেঁয়ালিই কখনও কখনও গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বে কিছুটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যেমন—

কাহারে ঘিণি মেলি অচ্‌ছহু কীস। বেড়িল হাঁক পড়অ চৌদিস॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। খনহ না ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥
তিন ন চ্‌ছুপই হরিণা পিবই না পানী। হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ তো। এ বন চ্‌ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ। ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই॥

ভুসুকুপাদ রচিত এ-পদের অর্থ এইরূপ—'কাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া কি ভাবে আছ? চারিদিক বেড়িয়া যে হাঁক পাড়িতেছে। নিজের মাংসের জন্যই হরিণ (জগতের) শত্রু। শিকারী ভুসুকু তাহাকে ক্ষণকালও ছাড়ে না। হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল পান করে না, হরিণ হরিণীর নিলয় জানি না। হরিণী বলে, হরিণ তুই শোন: এ বন ছাড়িয়া তুই উধাও হ। ত্বরিতগতি হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলে, মূঢ়ের হৃদয়ে (কিছুই) প্রবেশ করে না।

এইরূপ আরও পাই—

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তস্সু সাহা।
আসা বহুল পাত ফলবাহা॥

ইহার অর্থ মন হইতেছে তরু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, আশা বা বাসনা সকল তাহার ফল ও পাতা।

একটি পদে রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর কথা মনে করাইয়া দেয়—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।

সোনায় ভর্তি করুণার নৌকা, রূপা রাখিবার ঠাঁই নাই।

চর্যাপদ ধর্মের গান হইলেও তাহার কোন কোনটায় বেশ কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে যেমন—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥

উঁচু উঁচু পর্বত, তাহাতে বাস করে শবরী বালা, পরিধানে শবরীর ময়ূরপুচ্ছ, গলে গুঞ্জা মালা।

প্রায় প্রত্যেক চর্যাপদেই দুই একটি করিয়া প্রবচন দেখা যায়—

যেমন—'দুহিল দুধ কি বেণ্টে সামায়'—দোহা দুধ কি আবার বাঁটে প্রবেশ করে।

চর্যাপদগুলি গীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল, তাই প্রত্যেকটি পদের প্রারম্ভে উহা কোন রাগ বা রাগিনীতে গীত হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রাগ-রাগিনীর নাম পটমঞ্জরী, মল্লারী, মালসী ইত্যাদি। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ গীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত, ইহাতেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—চর্যাপদের পর বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই কাব্যখানির রচয়িতা কবি গ্রন্থমধ্যে বিভিন্ন ভাবে আপনার নামোল্লেখ করিয়াছেন: বড়ু চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা দেওয়ার ফলে কবির আসল নাম সঠিক জানিবার উপায় নাই, তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বড়ু চণ্ডীদাস নামেই খ্যাত।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রথম এবং শেষ দিকের কয়েকখানি পাতা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং কবি নিজে তাঁহার রচিত গ্রন্থের কি নামকরণ করিয়াছিলেন—এবং কোন সময়েই বা তাহা রচিত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। এই অমূল্য গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন প্রখ্যাত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায়। তিনিই ইহা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত হইবার পর পণ্ডিতমহলে একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যাটি হইতেছে—চণ্ডীদাস কয়জন? এতকাল চণ্ডীদাস নামক যে-কবিকে আমরা জানিতাম, যাহার সহজ সরল সুমধুর পদাবলী পাঠ করিয়া, গীত হইতে শুনিয়া আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতাম, শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকে সেই চণ্ডীদাস বলিয়া মনে করিয়া লইতে সংশয় জাগে। কেননা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা এত প্রাচীন, বর্ণনা-ভঙ্গী, বানান-পদ্ধতি এমন যে বাংলা সাহিত্যে একমাত্র চর্যাপদ ছাড়া আর কোথাও ইহার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যে কোথাও কোথাও যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতেও মনে হয় এই গ্রন্থটি 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' হইতে পৃথক পর্যায়ের। ভাব, ভাষা এবং রুচির দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং 'চণ্ডীদাসের পদাবলীর' মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই বাংলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। তবে কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা চণ্ডীদাস দুইজন নন, একজন। প্রথম বয়সে তিনি রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পরিণত বয়সে রচনা করেন পদাবলী। প্রথম বয়সের এবং পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। যাহা হউক— চণ্ডীদাস কয়জন ছিলেন এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখনও একমত হইতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাহাতে বুঝা যায়, তিনি বাশুলী দেবীর উপাসক এবং ভাগবতাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভাগবতের কাহিনী এবং জয়দেবের পদাবলীর অনুবাদও কবি কিছু কিছু করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যেই ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। কবির বাসস্থান সম্বন্ধে দুইটি পৃথক জনশ্রুতি প্রচলিত। এক জনশ্রুতিতে তাঁহার বাসস্থান ছিল বীরভূমের নান্নুরে— অপর জনশ্রুতিতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে।

রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী লইয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত। এই কাহিনী বাংলাদেশে পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নানা খণ্ডে বিভক্ত। জন্মখণ্ডে কৃষ্ণ বলরামের জন্ম হইতে শুরু করিয়া যথাক্রমে

তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালীয়-দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধা-বিরহ খণ্ডের মধ্য দিয়া কবি রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাব্যখানির একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহার মধ্যে নাটক ও গীতি-কবিতা এই দুই রীতির অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে। কৃষ্ণ রাধা ও বড়াইয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া নাটকীয় রস জমিয়া উঠিয়াছে, আবার রাধার বিরহ-বেদনা গীতি-কবিতার অপূর্ব মূর্ছনায় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া রাধা বড়াইকে বলিতেছেন—

এ ধন যৌবন বড়াই সবই অসার।
চিণ্ডিয়া পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিঁদুর।
বাহুর বলয়া মো করিব শংখচুর॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা রাঁধিতে গিয়া সব কেমন উলট-পালট করিয়া ফেলিলেন তাহার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন বড়ু চণ্ডীদাস।

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলো যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পানী॥

বাঁশীর শব্দ শুনিয়া রাধার সব কিছু গোলমাল হইয়া গিয়াছে। অম্বলে তিনি বেশোয়ার অর্থাৎ ঝাল বাটনা দিয়াছেন, শাকে ঢালিয়াছেন কানাসোআঁ অর্থাৎ পাত্র ভর্তি জল।

প্রকৃতির রূপ বর্ণনাতেও বড়ু চণ্ডীদাস কম দক্ষতা দেখান নাই—

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
এক সরী ঝুরেঁা মো কদম তলে বসী॥
চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥

দুর্যোগঘন ভয়ঙ্কর রাত্রিতে রাধা কদমতলায় একাকী বসিয়া বৃষ্টিধারার সঙ্গে নিজের অশ্রুধারা মিশাইতেছেন। চারিদিকে চাহিয়া কোথাও কৃষ্ণের দেখা পাইতেছেন না। পৃথিবী দ্বিধা হইলে তিনি তাহার গর্ভে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পণ্ডিতেরা করিয়াছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কথা বাদ দিলেও ইহার কাব্যমূল্য বড় কম নয়। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার এই কাব্যের মধ্যে তাঁহার কবিত্ব, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানবতা-বোধের যে পরিচয় দিয়াছেন সে-যুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা মিলে না।

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গল কথাটা সাধারণতঃ শুভ, কল্যাণ, ভালো—এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মঙ্গলকাব্যে কিন্তু শব্দটি ঠিক এই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। মঙ্গলকাব্যের মঙ্গল শব্দটির অর্থ হইতেছে মাহাত্ম্য, মহিমা, শক্তি। যেমন মনসামঙ্গল কাব্য বলিলে আমরা বুঝিব যে-কাব্যে মনসা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, চণ্ডীমঙ্গল বলিলে বুঝিব চণ্ডী-মাহাত্ম্য, শিবমঙ্গল বলিলে বুঝিব শিব-মাহাত্ম্য—ইত্যাদি।

দেবমহিমা অর্থে মঙ্গল শব্দটির প্রথম ব্যবহৃত হইতে দেখি আমরা কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-কাব্যে ঃ 'শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং

মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' (১।২৫)। পরবর্তী কালের অন্যান্য গ্রন্থেও শব্দটি ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যেমন—

'প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।'– চৈতন্য ভগবত।

মঙ্গল কাব্যগুলি প্রথম দিকে দেবদেবীর পূজা-উৎসব ইত্যাদিতে পরপর কয়েকদিন ধরিয়া গান করা হইত,—তাই ইহাদের অপর নাম মঙ্গলগান। কোন কোন পণ্ডিতের মত—কাব্যগুলি প্রধানতঃ 'মঙ্গল'-রাগে গীত হইত বলিয়া ইহাদের নাম ছিল মঙ্গলগান। সে যাহাই হউক, প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যেই যে দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ-মাহাত্ম্যও কিন্তু কোন স্থলেই মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। মহত্ত্ব, বীরত্ব, সাধুতার দিক দিয়া দেবচরিত্র প্রতি মঙ্গলকাব্যেই মানবচরিত্রের কাছে হীন প্রতিপন্ন হইয়াছে। মঙ্গল-কাব্যের দেবতা নানা ভয় দেখাইয়া অত্যাচার নির্যাতন করিয়া মানুষের নিকট হইতে পূজা পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বভাবতঃ তাঁহারা অনিষ্টকারী, পূজা পাইলে তুষ্ট হইয়া তবে অনিষ্ট করিতে বিরত হন এবং নানাভাবে তাঁহাদের ভক্ত পূজারীকে সাহায্য করেন। মনসা এবং শীতলা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইঁহারা সকলেই লৌকিক দেবদেবী। আর্যদের বাংলায় আগমনের পূর্বেই ইঁহারা সমাজে পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন। আর্যেরা আসিলে ধীরে ধীরে ইঁহারা আর্যসমাজেও পূজা পাইতে শুরু করিলেন। সংস্কৃত পুরাণে ইঁহাদের মার্জিত নবরূপ কল্পিত হইল।

মঙ্গল কাব্যগুলি প্রথমদিকে ছড়া ও ব্রতকথার আকারে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, ক্রমে বিভিন্ন কবির হাতে পড়িয়া সেগুলি বিশাল কাব্যের আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যেই কতকগুলি বাঁধা-ধরা রীতি বা ছাঁচ অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই কোন দেবতার স্বপ্নাদেশ পাইয়া কাব্যের রচনা শুরু করিয়াছেন। কাব্যের নায়ক-নায়িকারা প্রায় প্রত্যেকেই শাপভ্রষ্ট দেবতা। নানা দুঃখদুর্গতি ভোগ করিয়া দেবানুগ্রহেই তাঁহারা দুঃখমুক্ত হইয়াছেন, এবং এই মর্ত্যে এ-দেবতার পূজা প্রচার করিয়া তাঁহারা আবার দেবলোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যের প্রারম্ভেই গণেশ ও বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা, তাহার পর সৃষ্টিতত্ত্ব, দক্ষযজ্ঞ, উমার তপস্যা, গৌরীর বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা। ইহার পর মূল আখ্যায়িকা—এবং প্রায় প্রত্যেক আখ্যায়িকার ভিতরেই থাকিবে নারীগণের পতিনিন্দা, বারো মাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা, রন্ধনের বিশদ বিবরণ এবং সর্বশেষে চৌত্রিশ অক্ষর দিয়া দেবতার স্তুতি।

বাংলায় মঙ্গলকাব্য রচনা শুরু হইয়াছে সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ অথবা চতুর্দশ শতক হইতে এবং শেষ হইয়াছে অষ্টাদশ শতকে। প্রথম কাব্য কানা হরিদত্তের মনসামঙ্গল এবং শেষ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। ইহার মধ্যে যে কত দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ভাবিলে অবাক হইতে হয়! পূর্বোক্ত মঙ্গলকাব্য ছাড়া রচিত হইয়াছে শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, সারদামঙ্গল, অভয়া মঙ্গল,* রায়মঙ্গল (সুন্দরবনের বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়), আরও কত কি। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

---

* ডঃ আশুতোষ দাসের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। কবির নাম দ্বিজ রামদেব।

মনসামঙ্গল

পৃথিবীর সকল দেশেই এক সময় সর্পপূজা প্রচলিত ছিল, এখনও কোথাও কোথাও আছে। বাংলাদেশে আজও সর্প-দেবতা মনসার পূজা প্রচলিত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এই মনসার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া যে-কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

পরম শৈব চাঁদ সওদাগর তাঁহার ইষ্টদেবতার পূজার জন্য স্বর্গের অরণ্যে ফুল তুলিতে তুলিতে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ছিলেন মনসাদেবী নাগবাস-নাগাভরণ ভূষিতা। চাঁদের সাড়া পাইয়া নাগগণ ভয়ে পলাইয়া গেলে মনসা নিরাবরণা হইয়া পড়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া চাঁদকে অভিশাপ দিলেন, তুমি মর্ত্যে গিয়া মানুষ হইয়া জন্মাও। চাঁদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আমাকে যেমন তুমি বিনা অপরাধে অভিশাপ দিলে তেমনি আমারও অভিশাপ রহিল,— আমি পূজা না করিলে মর্ত্যে তোমার পূজা প্রবর্তিত হইবে না।

চাঁদ মর্ত্যে আসিয়া চম্পক নগরের বিজয় সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ নিত্য শিবপূজা করেন, আর তাঁহার স্ত্রী গোপনে মনসার ঘটপূজা করেন। চাঁদ ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া একদিন পদাঘাতে মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মনসা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চাঁদের সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চাঁদের ছিল মহাজ্ঞান এবং শঙ্কর গারুড়ী নামে এক অজর অমর ওঝা বন্ধু। মনসার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। মনসা শেষে গারুড়ীর স্ত্রীর নিকট হইতে কৌশলে তাঁহার মৃত্যুর উপায় জানিয়া লইয়া তাঁহাকে বধ করিলেন, এবং মোহিনী নারীর বেশে চাঁদকে ছলনা করিয়া মহাজ্ঞান হরণ করিলেন। ফলে চাঁদ হইলেন অসহায়। এইবার মনসা অতি

সহজেই চাঁদের সর্বনাশ করিতে শুরু করিলেন। মনসার কোপে চাঁদের গুয়াবাড়ি (সুন্দর বাগানবাড়ি) বিনষ্ট হইল, ছয় ডিঙা ডুবিল, ছয় পুত্র সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইল। সনকার হাহাকারে পশুপাখি কাঁদিতে লাগিল। স্বামীর পায়ে ধরিয়া তিনি মিনতি করিয়া বলিলেন, এইবার তুমি মনসার পূজা কর, কিন্তু চাঁদ অবিচল অটল। তিনি বলিলেন,—

যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি
সে হাতে পূজিব আমি চেঙ্গমুড়ি কানী ?—কখনই না।

তাঁহার মনের দৃঢ়তা যেন আরও বাড়িয়া গেল, তিনি এবার চৌদ্দ ডিঙা সাজাইয়া বাণিজ্যে বাহির হইলেন। ফিরিবার পথে মনসার কোপে সমুদ্রে উঠিল ঝড়, চাঁদের চৌদ্দ ডিঙা ডুবিয়া গেল। চাঁদ পূজা না করিলে মর্ত্যে মনসা পূজা প্রচারিত হইবে না বলিয়া মনসা চাঁদের জীবনটুকু শুধু বাঁচাইয়া রাখিলেন। বিদেশে বারো বৎসর নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া চাঁদ অবশেষে ভিক্ষুকের বেশে নিজের দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর তখন পূর্ণ যুবক। পুত্র মুখ দেখিয়া চাঁদ সকল দুঃখ ভুলিয়া তাহার বিবাহের আয়োজন করিলেন। উজানী নগরের সায় বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির হইল। বিবাহের রাত্রে সর্পদংশনে লখিন্দর প্রাণ হারাইবে, এই তাহার ভাগ্য লিখন। চাঁদ উহা খণ্ডন করিতে সাঁতালী পর্বতের উপর নিশ্ছিদ্র এক লৌহ বাসর নির্মাণ করাইলেন। সেখানে অসংখ্য ময়ূর ও নেউল ছাড়িয়া দিলেন, সর্পবিষনাশক অনেক গাছ-গাছড়া লাগাইলেন, কিন্তু নিয়তিকে কিছুতেই খণ্ডন করা গেল না। মনসার অনুরোধে কারিগর লৌহ-বাসরের এক জায়গায় চুলের মত একটি ছিদ্র রাখিয়া দিয়াছিল, মনসার

আদেশে কালীনাগ ঐ ছিদ্রপথে আসিয়া বিবাহরাত্রেই লখিন্দরকে দংশন করিল।

বেহুলা কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া লখিন্দরের মৃতদেহ লইয়া ভেলায় চাপিয়া গাঙ্গুরের স্রোতে ভাসিয়া চলিল। যেমন করিয়া হউক স্বামীকে সে বাঁচাইয়া আনিবেই। পথে কত লোকে কত প্রলোভন দেখাইল, কেহ বা বল প্রয়োগ করিতে গেল, বাঘ শিয়াল কুমীরে তাড়া করিল, বেহুলার মন কিছুতে বিচলিত হইল না। অবশেষে মৃতদেহের পচন শুরু হওয়ায় মাংস গলিয়া গেল, হাড় টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িল। ভেলা ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। বেহুলা এক খুঁটিতে ভেলা বাঁধিয়া তীরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। এইখানে সে স্বর্গের ধোপানী নেতার সাক্ষাৎ পাইল। নেতার ছেলে দুরন্তপনা করিতেছিল, নেতা তাই তাহাকে পাটায় আছড়াইয়া মারিয়া ধীরে-সুস্থে কাপড় কাচিতে লাগিল। যাইবার সময় সে মন্ত্র পড়িয়া আবার ছেলেকে বাঁচাইয়া লইয়া গেল। পরের দিন নেতা আসিলে বেহুলা তাহার পায়ে ধরিয়া বলিল, তুমি আমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দাও। নেতা আসলে মনসার সখী। সে বলিল, তোমার স্বামীর প্রাণ-দান আমার সাধ্য নয়, ইহা কেবল মনসাই পারেন। বেহুলার অবস্থা দেখিয়া নেতার বড় মায়া লাগিল, তাই সে তাহাকে সাহায্য করিবে প্রতিশ্রুতি দিল। বেহুলা সেদিন নেতার কাপড় কাচিয়া দিল।

দেবতারা সে কাপড় পাইয়া নেতাকে বলিলেন, নেতা, কই এতদিন ত তুমি এত সুন্দর কাপড় কাচ নাই? নেতা বলিল, এ-কাপড় আমার বোনঝি কাচিয়াছে। দেবতারা খুশি হইয়া তাহার বোনঝিকে সঙ্গে আনিবার অনুমতি দিলেন। বেহুলা পরের দিন দেবসভায় গিয়া তাঁহার

অপূর্ব নৃত্য দেখাইয়া দেবগণকে মুগ্ধ করিলে মহাদেব তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। বেহুলা তাহার স্বামী, ছয় ভাসুর, শ্বশুরের মাঝি-মাল্লাদের প্রাণ ফিরাইয়া দিতে প্রার্থনা করিল, তাহার সঙ্গে নিমজ্জিত চৌদ্দ ডিঙা। শিব মনসাকে ঐ সব ফিরাইয়া দিতে বলিলে মনসা উত্তর দিলেন, হাঁ, আমি সবই ফিরাইয়া দিব—কিন্তু বেহুলা গিয়া তাহার শ্বশুরকে দিয়া আমার পূজা করাইবে এই শর্তে। বেহুলা তাহাতেই রাজী।

বেহুলা শ্বশুরের সাত পুত্র ও মাঝি-মাল্লা সমেত চৌদ্দ ডিঙা লইয়া যখন ঘরে ফিরিল তখন তাহা দেখিয়া চাঁদের আনন্দের সীমা ছিল না, যখন শুনিলেন তাঁহাকে প্রতিদানে মনসা পূজা করিতে হইবে তখন আবার বাঁকিয়া বসিলেন। বেহুলার কান্নাকাটিতে শেষে তাহার মন একটু নরম হওয়ায় চাঁদ বাম হাতে একটা ফুল লইয়া মুখ ফিরাইয়াই মনসার ঘটের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন, যে-হাতে তিনি শিব পূজা করিতেন সে ডান হাত তিনি আর কলঙ্কিত করিলেন না, ইহাতে তাঁহারও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল, আবার কোনরূপে একটি ফুল পাইয়া মনসারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, মর্ত্যে তাহার পূজা প্রচারিত হইল।

মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্রে যে-দৃঢ়তা এবং বেহুলা চরিত্রে যে-পতিপ্রেম, ধৈর্য, ও কমনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে শুধু বঙ্গ-সাহিত্য কেন, বিশ্বসাহিত্যেও তাহা সুদুর্লভ।

এই কাহিনী লইয়া সর্বপ্রথম যিনি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন তাঁহার নাম হইতেছে হরি দত্ত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থারম্ভে এই কবিরই নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

'প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত।'

হরি দত্ত চৈতন্যদেবের জন্মের অন্তত দুই শত বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় কবিত্বের সঙ্গে

পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মনসার সর্পসজ্জা বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সুতলি।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলী॥
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছুনি॥—ইত্যাদি

হরি দত্তের পরেই নাম করিতে হয় নারায়ণ দেবের। তিনি মৈমনসিংহ জিলার বোর গ্রামের অধিবাসী। আত্মপরিচয়ে তিনি লিখিয়াছেন 'রাঢ় ত্যাজিয়া মোর বোর গ্রামে বসতি'। ইঁহার কাব্য পূর্ববঙ্গ ছাড়া আসামেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। নারায়ণ দেবের রচনায় শুধু যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে করুণ রস সৃষ্টিতেও ইঁহার জুড়ি মিলে না। সর্পদংশনের জ্বালায় অস্থির লখিন্দর বেহুলাকে যাহা বলিতেছে তাহার বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

ওঠ ওঠ প্রাণ প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতি তলে!
অকারণে রাঁড়ি হইলা খণ্ড ব্রত ফলে॥
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লখিন্দর॥

প্রাক্‌চৈতন্য যুগের মনসামঙ্গলের আর একজন সুবিখ্যাত কবি হইতেছেন বিজয় গুপ্ত। তাঁহার নিবাস ছিল ববিশালের ফুল্লশ্রী গ্রাম। তাঁহার রচনায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সঙ্গে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বঙ্গসমাজের সাহিত্যজীবনের একটি নিখুঁত চিত্র তাঁহার রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া আছে প্রচুর

হাস্যরস, কথায় কথায় ব্যঙ্গের অবতারণা। করুণ রস সৃষ্টিতেও বিজয় গুপ্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচনায় পাই লখীন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার বিলাপ শুনিতে পাইয়া সনকা—

কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়॥
দুই হস্ত ধরি রাণী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল রাণী বদন কমলে॥

কোন কোন পণ্ডিতের মতে মনসামঙ্গল রচয়িতা কবি বিপ্রদাসও প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি, কিন্তু তাঁহার রচনায় এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যে তাহা দেখিয়া তাঁহাকে অনেকটা আধুনিক যুগের বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক পরে প্রায় দেড় শত বৎসর পরে দ্বিজ বংশীদাস নামে একজন মনসামঙ্গল রচনা করিয়া বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। কিশোরগঞ্জের পাটওয়ারী গ্রাম ছিল কবির জন্মভূমি। বংশীদাস একাধারে ছিলেন সাধক ও কবি। গ্রামে গ্রামে নিজের রচিত মনসামঙ্গল গাহিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন। শোনা যায়, এইরূপ গান গাহিয়া 'জালিয়ার হাওয়া' পার হইবার সময় তিনি নরঘাতক দস্যু কেনারামের হাতে পড়েন। কেনারাম তাঁহার প্রাণবধে উদ্যত হইলে তিনি জন্মের শেষ একবার তাঁহার প্রিয় মনসামঙ্গল গান করিয়া লইতে চাহিলেন। কেনারাম সম্মত হইল। গান শুনিতে শুনিতে দস্যুর পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইল, শেষে সে কাঁদিয়া কবির পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

এ-পর্যন্ত মনসামঙ্গলের যে কবিগুলির কথা আলোচিত হইল তাঁহারা সকলেই পূর্ববঙ্গের। পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যে বিশেষ ভাবে

উল্লেখযোগ্য কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। কবির আসল নাম ক্ষেমানন্দ, কেতকা অর্থাৎ মনসার দাস বলিয়া তিনি নিজের পরিচয় দিতেন। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করেন। নিবাস ছিল তাঁহার দামোদরের নিকটে কোন গ্রামে।

উত্তর বঙ্গে মনসামঙ্গলের যে-সকল কবি আবির্ভূত হন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হইতেছেন জগজ্জীবন ঘোষাল। ইনি জীবন-রস-রসিক ছিলেন। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে দিনাজপুরে কোচ আমোরা গ্রামে তাঁহার জন্ম। আর একজন হইতেছেন বগুড়ার লাহিড়ী-পাড়া গ্রামের জীবন মৈত্র। ইহার রচনা তেমন উচ্চাঙ্গের ছিল না।

চণ্ডীমঙ্গল

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গলের পরই নাম করিতে হয় চণ্ডী-মঙ্গলের। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি,—একটি কালকেতুর উপাখ্যান, আর একটি ধনপতি সদাগরের।

কালকেতুর উপাখ্যানটি এইরূপ—

ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর পিতার শিবপূজার জন্য ফুল তুলিতে বাহির হইয়া দেখেন নন্দন কাননে একটিও ফুল নাই, অগত্যা তাঁহাকে মর্ত্যে নামিয়া আসিতে হইল। মর্ত্যের বনে ফুল তুলিতে গিয়া দেখেন এক ব্যাধ মৃগের পিছু ধাওয়া করিতেছে। কিছুক্ষণ তিনি উহাই দেখিতে লাগিলেন, পুষ্পচয়নে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। শেষে তাড়াহুড়া করিয়া তিনি যে ফুল তুলিলেন তাহার মধ্যে একটি কীট রহিয়া গেল। এ-কীট অবশ্য কীট নয়, ছদ্মবেশী চণ্ডী। ইন্দ্র ঐ ফুল দিয়া পূজা করিবার সময় কীটরূপিনী চণ্ডী শিবকে দংশন করিলেন। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শিব ইন্দ্রকে

অভিশাপ দিতে গেলে ইন্দ্র বলিলেন, দোষ আমার নয়, ফুল তুলিয়াছে আমার পুত্র নীলাম্বর। নীলাম্বরকে ডাকা হইলে তিনি অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। শিব তখন তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, 'বসুমতী চল ঝাট হও গিয়া ব্যাধ।' ফলে নীলাম্বর ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, নাম হইল তাঁহার কালকেতু। নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াও স্বামীর অনুগমন করিয়া ব্যাধের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেন, নাম হইল ফুল্লরা। যথাসময়ে তাঁহাদের বিবাহ হইল। দুর্ধর্ষ শিকারী কালকেতুর অত্যাচারে বনের সব পশু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। পশুরাজ সিংহ দেবী চণ্ডীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিলে চণ্ডী বলিলেন—

সিংহ তুমি মহাতেজা পশু মধ্যে তুমি রাজা
তোর নখে পাষাণ বিদরে,
শুনিয়া তোমার রা কাঁপয়ে সবার গা
কি কারণে ভয় কর নরে?

যাহা হউক,—'আজি হইতে মনে কিছু না করিহ ভয়'। ব্যবস্থা করিতেছি।

পরের দিন দেবী গোধিকা-রূপ ধারণ করিয়া কালকেতুব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। বনে অন্য কোন শিকার না মিলায় কালকেতু জালদড়ি দিয়া সেই গোসাপ বাঁধিয়া লইয়া ঘরে আসিল। ফুল্লরা তাহার সইয়ের বাড়ি হইতে খুদ ধার করিয়া আসিয়া দেখেন তাহাদের ঘরে এক অসামান্যা রূপসী নারী। কালকেতু তখন বাসি মাংস বেচিতে গিয়াছে। ফুল্লরা সুন্দরীর পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন—

আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে,
আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে।

আমি এইখানেই থাকিতে চাই। ফুল্লরা তাঁহাকে কত করিয়া বুঝাইল, কত ধর্মকথা শুনাইল, সুন্দরী তাহা কানেও তুলিলেন না, ফুল্লরা তখন নিজের বারমাসের দুঃখের কথা শুনাইল, সুন্দরী বলিলেন,—'আজ হইতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।' ফুল্লরা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর খোঁজে চলিল। দেখা হইলে কালকেতু ফুল্লরার এই অবস্থা দেখিয়া বলিল—

শাশুড়ী ননদী নাই, নাই তোর সতা
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা ?

ফুল্লরা বলিল—

পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ?

কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরে আসিয়া সেই ষোড়শী সুন্দরীকে তীর মারিতে উদ্যত হইলে তিনি আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, তিনি দেবী চণ্ডী, গোধিকারূপ ধারণ করিয়া তাহার ঘরে আসিয়াছেন। তিনি কালকেতুর দুঃখ দূর করিতে চান। অতঃপর দেবী কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন এবং একটি আংটি দিয়া গুজরাটে নগর পত্তন করিতে আদেশ দিলেন, এবং সেখানে মন্দির নির্মাণ করিয়া মঙ্গলবারে তাঁহাকে পূজা করিতে বলিলেন। কালকেতু গুজরাটের বন কাটাইয়া সুন্দর নগর পত্তন করাইলে ভাঁড়ু দত্ত নামে এক শঠ কালকেতুর নিকটে মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিল। কালকেতু তাহাকে ভাগাইয়া দিল। অপমানিত ভাঁড়ু কলিঙ্গরাজের দ্বারা কালকেতুর নগর আক্রমণ করাইল। কালকেতু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইল। সেই অবস্থায় কালকেতু চণ্ডীর চৌত্রিশা স্তব করিলে চণ্ডী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ দিলেন তাঁহার ভক্ত কালকেতুর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে। ইহার পর কিছুকাল রাজ্যসুখ

ভোগ করিয়া কালকেতু ও ফুল্লরা তাহাদের পূর্ব দেবরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

এইবার ধনপতি সদাগরের কাহিনী—

উজানী নগরের ধনপতি সদাগর পায়রা উড়াইতেছিলেন। তাঁহার একটি পায়রা বাজপাখির তাড়া খাইয়া খুল্লনা নামে এক সুন্দরী বণিক-কন্যার আঁচলের নীচে লুকাইল। ধনপতি তাঁহার পায়রা ফেরত চাহিলে খুল্লনা উহা না দিয়া অন্তঃপুরে পলাইয়া গেলেন। ধনপতি খুল্লনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ঘটক পাঠাইলেন। খুল্লনার পিতার এ-বিবাহে আপত্তি নাই, আপত্তি ধনপতির প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান লহনার। ধনপতি লহনাকে পাঁচ ভরি সোনা ও একখানা পাটশাড়ি উপহার দিলে লহনাও শেষে এ-বিবাহে মত দিলেন। বিবাহের পর ধনপতি কিছুদিনের জন্য বিদেশে গেলেন। এই অবসরে লহনা দুর্বলা দাসীর পরামর্শে খুল্লনার উপর নানা উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। স্বামীর জাল চিঠি দেখাইয়া তিনি খুল্লনাকে খুঁয়া পরিতে, আধপেটা খাইতে এবং ছাগল চরাইতে বাধ্য করিলেন। বনে বনে এইরূপ ছাগল চরাইবার সময়েই পঞ্চ দেবকন্যা আসিয়া খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিখাইয়া গেলেন। ধনপতি বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া লহনাকে খুল্লনার প্রতি তাহার দুর্ব্যবহারের জন্য অনেক তিরস্কার করিলেন। কিছুদিন পরই রাজাদেশে চন্দন আনিবার জন্য তিনি সিংহল যাত্রা করিলেন। যাত্রার সময় স্বামীর মঙ্গলের জন্য খুল্লনা চণ্ডীপূজা করিতেছিলেন। শিবভক্ত ধনপতি চণ্ডীকে ডাইনী দেবতা বলিয়া তাহার ঘটে লাথি মারিয়া গেলেন। চণ্ডী ইহাতে কুপিতা হইয়া মাঝ দরিয়ায় ধনপতির ছয় ডিঙা ডুবাইয়া দিলেন। ধনপতি তাঁহার মধুকর ডিঙার সঙ্গে কোনরূপে সিংহলে গিয়া পৌঁছিলেন। সিংহলে আসিবার পথে সমুদ্রের বুকে ধনপতি দেবীর

ছলনায় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছিলেন : প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসিয়া এক অপরূপ সুন্দরী নারী একটি হাতী গিলিতেছেন এবং পরক্ষণেই উহা উগরাইয়া দিতেছেন। রাজার কাছে আসিয়া তিনি ঐ ঘটনার কথা বলিলেন এবং রাজাকে উহা দেখাইতে পারেন জানাইলেন। কিন্তু রাজা দেখিতে আসিলে তিনি দেখাইতে না পারিয়া রাজ-কারাগারে বন্দী হইলেন। বহু বৎসর কাটিয়া গেল। এদিকে খুল্লনার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল, তাহার নাম শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত বড় হইয়া পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করিল। পথে সেও কমলে কামিনী দেখিয়া আসিল, এবং রাজাকে উহা দেখাইতে গিয়া দেখাইতে না পারায় প্রাণদণ্ডের জন্য তাহাকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল। মশানে শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব আরম্ভ করায় চণ্ডী ভূতপ্রেত লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্তকে রক্ষা করিলেন। চণ্ডীর কৃপায় সিংহলরাজ নিজেও কমলে কামিনী দেখিলেন। ধনপতি মুক্তি পাইলেন। সিংহলরাজ শ্রীমন্তের সহিত স্বীয় কন্যা সুশীলার বিবাহ দিলেন। ধনপতি পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া মহানন্দে দেশে ফিরিলেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতার নাম মানিক দত্ত। চণ্ডী-মঙ্গলের সুপ্রসিদ্ধ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার পূর্বগামীদের বন্দনায় গাহিয়াছেন—

মানিক দত্তেবে আমি করিলুঁ বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয়॥

মানিক দত্ত চতুর্দশ শতাব্দীর কবি, নিবাস ছিল তাঁহার মালদহ বা গৌড়অঞ্চলে। কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বাস্তবধর্মী। তাঁহার রচনা হইতে খুল্লনা ও লহনার বিবাদের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

খুল্লনার বচনে লহনা উঠিল জ্বলিয়া।
লড় দিয়া চুলের মুঠি ধরিল চাপিয়া॥
চুলেতে ধরিয়া গালেতে দিল চড়।
চাপিয়া বসিল খুলনাইর বুকের উপর॥
কাড়িয়া লইল তার অষ্ট আভরণ।
পরিবার আজ্ঞা দিল খুঞিঞার বসন॥

ইহার পর নাম করিতে হয় মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধবের। ইহার আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ। কবির আত্মপরিচয়ে জানা যায়—মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম নিবাসী এই কবি ১৫০১ শক বা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা সমাধা করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের রচনা বাস্তবধর্মী, সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উজ্জ্বল। যুবতী সতিনী খুল্লনার উপর লহনা কিরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহার বর্ণনায় দ্বিজ মাধব লিখিয়াছেন।

খুল্লনা বসিলা ছেলী থুইয়া অজাশালে।
মানের পাতে লহনার ক্ষুদের অন্ন বাড়ে॥
অল্প অন্ন দিল ছেছা পোড়া বহুল।
পাটশাক রান্ধি দিল পাকা কলার মূল॥
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী।
ভোজন করিতে বৈসে খুল্লনা বাণ্যানী॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। ইহার উপাধি হইতেছে কবিকঙ্কণ। মুকুন্দরাম শুধু চণ্ডীমঙ্গলের নয়, সমুদয় মধ্যযুগের পুরানো বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ লেখক।

কবি তাঁহার কাব্যে যে-আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে পাওয়া যায়, এখন হইতে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে

তাঁহাব জন্ম হয়। ছয় সাত পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা ঐ গ্রামে বাস করিয়াছেন। তাহার পর মানসিংহ যখন বাংলার শুবাদার হইলেন—

সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥
উজির হৈল রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥

প্রজারা তাই নিজেদের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। মুকুন্দবামও নিজের স্ত্রী পুত্র ও একটি ভাইকে সঙ্গে লইয়া পৈতৃকভূমি ত্যাগ করিলেন। পথে অনাহারে নিরাশ্রয়ে বহু কষ্ট ভোগ করিয়া রূপনারায়ণ, দামোদর পার হইয়া তিনি মেদিনীপুরেব আড়রা গ্রামে আসিয়া হাজির হইলেন। ওখানকার ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়। মুকুন্দরাম ঐ জমিদারের প্রশংসা করিয়া এক কবিতা লিখিয়া দেখা করিলে জমিদার তাঁহাকে পাঁচ আড়া ধান দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। পরে বাঁকুড়া রায় কবিকে তাহার পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কবি এই রঘুনাথের নির্দেশেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

এই কাব্যে মুকুন্দরাম যে-কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন পুরানো বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা মেলে না। কবির চরিত্রাঙ্কন, বাস্তব বর্ণনা, দুঃখ বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। স্বার্থপর কুটিল মুরারী শীল এবং শঠ ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র যেমন কোন পাঠকই ভুলিতে পারেন না, খুল্লনার বারোমাসের দুঃখের কথাও তেমনি ভুলিবার

নয়। কবি জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছেন বলিয়া দুঃখ বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

মুকুন্দরামের পর চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুক্তারাম সেন এবং মেদিনীপুর জিলার হরিরাম নামক দুই কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কাব্যে কোন বৈশিষ্ট্য মিলে না, তাঁহারা যথাক্রমে দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

ধর্মমঙ্গল

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যের সঙ্গে তাঁহার বরপুত্র লাউসেনের অতিলৌকিক বীরত্ব ও তপস্যার কাহিনী লইয়া যে-সকল কাব্য রচিত হইয়াছে তাহাই হইতেছে ধর্মমঙ্গল কাব্য। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে এবং ছোটনাগপুরের কিয়দংশে ধর্মঠাকুরের পূজা এখনও প্রচলিত। ধর্মঠাকুর আদিতে আর্যদেবতা ছিলেন না, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতির মধ্যেই ইঁহার পূজা সীমাবদ্ধ ছিল, পরে বরুণ, যম, আদিত্য, ইন্দ্র, শিব, প্রভৃতির সহিত এক হইয়া বৈদিক পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে মিশিয়া আর্যসমাজেও পূজা পাইতে শুরু করিলেন।

ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নাই, কূর্মাকৃতি প্রস্তর খণ্ডই ইঁহার প্রতীক। দেখিতে উহা অনেকটা বৌদ্ধ স্তূপ বা চৈত্যের মত। এখনও উচ্চ নীচ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল লোকই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এই ঠাকুরের কাছে মানসিক করে, এবং প্রার্থনা সফল হইলে দেবতার সম্মুখে ছাগ, শূকর, হাঁস, মুরগী, কবুতর ইত্যাদি বলি দেয়, ভোগে দেওয়া হয় পিঠা, মদ্য ও চুন। এই সকল উপকরণ দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয় হিন্দু দেবতার ছদ্মবেশে প্রাচীন কোন অনার্য দেবতাই পূজা পাইতেছেন।

বর্তমানে ধর্মঠাকুর এক রকম শিবেই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে বারোদিন ধরিয়া ধর্মের যে 'বারমতি' গাজন গাওয়া হইত এখন তাহা শিবের চড়ক গাজনে পরিণত হইয়াছে।

ধর্মপূজার ইতিহাস, মন্ত্র, পূজাপদ্ধতি, এবং ধর্মঠাকুরের প্রথম পূজারী রামাই পণ্ডিতের কাহিনী লইয়া রচিত গ্রন্থের নাম ধর্মপুরাণ বা শূন্য পুরাণ। আর লাউসেনের অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী লইয়া রচিত গ্রন্থ হইতেছে—ধর্মমঙ্গল কাব্য। এই কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ—

ধর্মপালের পুত্র তখন গৌড়ের সিংহাসনে। রাজার শ্যালক মহামদ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী। মহামদ অতীব দুর্জন, স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী। সোম ঘোষ নামে এক বিশ্বস্ত প্রজাকে তিনি অকারণ বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া ত্রিষষ্ঠীব গড়ে পাঠাইয়া দিলেন। ত্রিষষ্ঠীর গড় ছিল তখন কর্ণ সেন নামে এক সামন্ত রাজার অধীনে। সোম ঘোষের কাজ হইল এই গড়ের তত্ত্বাবধান করা। সোম ঘোষের এক পুত্র ছিল, নাম ছিল তাহার ইছাই ঘোষ। ইছাই কর্ণ সেনকে গড় হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজেই গড়ের মালিক হইয়া বসিল। শুধু তাহাই নয়, রাজার খাজনা দেওয়াও সে বন্ধ করিল। রাজকর্মচারীরা খাজনা চাহিতে আসিলে সে তাহাদিগকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া গড় আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে গৌড়ের সৈন্য ত পরাজিত হইলই, অধিকন্তু কর্ণ সেনের ছয় পুত্র নিহত হইল। শোকে কর্ণ সেনের স্ত্রী আত্মঘাতিনী হইলেন, কর্ণ সেন হইলেন পাগল। গৌড়েশ্বর নিজের সুন্দরী শ্যালিকা এবং মহামদের ভগিনী রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণ সেনের বিবাহ দিয়া পুনরায় তাঁহাকে

সংসারী করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু মহামদের ইহাতে আপত্তি। রাজা তখন কৌশলে মহামদকে দূরে পাঠাইয়া রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণ সেনের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা করিয়া পাঠাইলেন। মহামদ সংবাদ পাইয়া ক্রোধে আত্মহারা হইলেন, রাজাকে কিছুই করিবার উপায় নাই বলিয়া রাগ গিয়া পড়িল তাঁহার রঞ্জাবতী এবং কর্ণ সেনের উপর। কর্ণ সেন বৃদ্ধ। অনেক দিন পর্যন্ত রঞ্জাবতীব কোন সন্তান না হওয়ায় মহামদ তাঁহাকে বন্ধ্যা বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। রঞ্জাবতী কঠোর তপস্যা দ্বারা ধর্মকে তুষ্ট করিয়া পুত্রলাভ করিবেন, এই সঙ্কল্প লইয়া চাঁপাই নদীর দ্বাপে গিয়া শালে ভর দিলেন (কণ্টক শয্যা লইলেন)। ধর্মরাজ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্র বর দিলেন।

যথাসময়ে তাঁহার পুত্রলাভ হইলে তাহার নাম রাখা হইল লাউসেন। মহামদ লাউসেনকে চুরি করিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা তাঁহাব সফল হইল না। এই সময় ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে আর একটি পুত্র দিলেন—তাহার নাম—কর্পূরপবল। লাউসেন বড় হইয়া ভাল করিয়া মল্ল-বিদ্যা শিখিলেন। অতঃপর কর্পূরধবলকে সঙ্গে লইয়া তিনি গৌড়েশ্বরের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। পথে জালন্দার গড়ে কামদল বাঘ এবং তারা দীঘিতে কুমীর মারিয়া তিনি রাজদরবাবে গিয়া হাজির হইলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। মহামদ ভাগিনেয়কে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য গৌড়েশ্বরের আদেশ দিয়া তাঁহাকে কামরূপ জয় করিতে পাঠাইলেন। লাউসেন কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফিরিলেন।

এদিকে সিমুলার রাজা হরিপালের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, নাম ছিল তাহার কানাড়া। বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরের বড় ইচ্ছা ছিল তাহাকে

বিবাহ করা, কিন্তু কানাড়া লাউসেনকেই মনে মনে পতিরূপে কামনা করিয়া আসিয়াছে, তাই সে এক লৌহনির্মিত গণ্ডার উপস্থাপিত করিয়া বলিল, যিনি এ-গণ্ডার এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবেন সে তাঁহাকেই বিবাহ করিবে। বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর তাহা পারিবেন কেন? অবশেষে লাউসেন আসিয়া এক কোপে গণ্ডার কাটিয়া কানাড়ার বরমাল্য লাভ করিলেন।

ইহার পর মহামদের পরামর্শে রাজা লাউসেনকে দুর্দান্ত ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন, লাউসেন পিতৃশত্রু ইছাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর লাউসেনকে এক মহাসঙ্কটে ফেলা হইল। রাজার আদেশ —তাঁহাকে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইতে হইবে। না পারিলে লাউসেনের পিতামাতাকে শূলে দেওয়া হইবে। এই অসাধ্য সাধনের জন্য লাউসেন ধর্মঠাকুরের পীঠস্থান হাকন্দে গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কিছুতেই প্রসন্ন হন না দেখিয়া অবশেষে লাউসেন নিজের মাথা কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন। ধর্মঠাকুর এবার প্রসন্ন হইলেন। পশ্চিমে সূর্যোদয় হইল। ঠাকুরের কৃপায় লাউসেনও প্রাণ পাইলেন।

এদিকে লাউসেন যখন হাকন্দে তপস্যারত তখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করিলেন। লাউসেনের আশ্রিত কালুডোম যুদ্ধ করিল না, রানী কানাড়া নিজেই যুদ্ধ করিয়া মহামদকে বিতাড়িত করিলেন। দুর্বৃত্ত মহামদ ধর্মের কোপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন, অবশেষে উদার লাউসেনের কৃপাতেই মহামদ কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ইহার পর লাউসেন পরম গৌরবে ময়নায় রাজত্ব করিয়া যথাকালে স্বর্গারোহণ করিলেন। মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল।

ধর্মমঙ্গলের আদি কবি হয়তো ময়ূর ভট্ট, কারণ এই কাব্যের প্রায় প্রতি কবিই গাহিয়াছেন, – ' ময়ূর ভট্ট বন্দিব সঙ্গীতের আদিকবি।" কিন্তু ময়ূর ভট্টের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই।

কাহারও কাহারও মতে খেলারামই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি, কিন্তু তাঁহারও কোন সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী কোন কোন কাব্যে রূপরামকেই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি বলা হইয়াছে। রূপরামের সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া গিয়াছে। ইহার কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। করুণ মর্মস্পর্শী বাস্তব চিত্রাঙ্কণে রূপরাম সিদ্ধ হস্ত।

ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিদের নাম হইতেছে—রামদাস আদক, সীতারাম দাস, প্রভুরাম, ঘনরাম, রামচন্দ্র, মানিক গাঙ্গুলী, সহদেব, নরসিংহ, হৃদয়রাম, গোবিন্দরাম, রামকান্ত প্রভৃতি।

রামদাস জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন, নিবাস ছিল হুগলী জিলার হায়ৎপুরে। ইঁহার কাব্যে রূপরামের প্রভাব আছে। কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল। ভাষা সরল। সীতারামের বাস ছিল বর্ধমানের সুখসাগর গ্রামে। প্রকৃতির শোভা ইত্যাদি বর্ণনায় ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান বর্ধমানের অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রাম। ইনি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে কাব্য রচনা করেন। ইঁহার উপাধি ছিল কবিরত্ন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঘনরামের কাব্য অনুপ্রাসবহুল ও পাণ্ডিত্য প্রভায় সমুজ্জ্বল। তবে মাঝে মাঝে তিনি অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন,—যেমন উত্তর দিক বুঝাইতে লিখিয়াছেন 'বিরাট-তনয়-মুখ',—উষা বুঝাইতে বলিয়াছিলেন 'গোবিন্দ-তনয়সুত-জায়া'। স্ত্রী চরিত্র পরিকল্পনায় কিন্তু

ঘনরামের বেশ একটু বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কামরূপরাজ যখন নিজের কন্যাকে লাউসেনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া সন্ধি করিতে গেলেন, তখন তাঁহার—

রাণী বলে কুলেব পদ্মিনী ওই বালা।
না করো মাথায় নাথ কলঙ্কের ডালা॥
এ বড় অবনী জুড়ে অতিশয় লাজ।
পরাজয় হয়ে কন্যা দিলা মহারাজ॥

মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত। ইহার রচনা ঘনরামের রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট—কিন্তু হাস্যরসদীপ্ত।

রামায়ণ ও মহাভারত

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে ফলে শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল যোগাইয়া আসিয়াছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত তেমনি করিয়া চিরদিন আমাদের মনের অন্নপানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে।'

মানুষ তাহার সহজাত আগ্রহ বশেই যেমন শুনিতে চায় ধর্ম কি, সত্য কি, আদর্শ কি—তেমনি শুনিতে চায় বীরত্ব, প্রেম, ভক্তি, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা প্রীতির কাহিনী। বাংলা পয়ার ছন্দে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙ্গালীর এই জ্ঞান-ক্ষুধা ও আনন্দরস-পিপাসা মিটাইয়াছে।

মূল রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃতে রচিত বলিয়া সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ

বাঙালী এই দুই কাব্যের রস গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কবি মধুসূদন তাঁহার কাশীরাম দাস শীর্ষক কবিতায় যথার্থই লিখিয়াছেন—

চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিতে রোদন।

বাল্মীকি রামায়ণ সম্বন্ধে ঐ একই কথা। কয়জন বাঙালী উহার রসাস্বাদন করিতে পারিতেন? কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস ঐ দুইখানি মহাকাব্য বাংলায় অনুবাদ করিয়া বাঙালীর একটা পরম আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। অনুবাদ বলিলে হয়তো একটু ভুল হইল,—ভাবানুবাদ। ইহাও বুঝি ঠিক হইল না, বলা উচিত এই দুই বাঙালী জীবনরসিক শিল্পী বাঙালী হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নূতন করিয়া পরিবেশণ করিয়াছেন। ইহা করিতে তাঁহাদের মূল কাব্যের কত কিছু বর্জন করিতে হইয়াছে, কত কিছু নিজের কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিতে হইয়াছে! ইহা তাঁহাদের নিজস্ব সৃষ্টি।

রামায়ণ—বাংলায় রামায়ণ অনেক কবিই রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম হইতেছেন কৃত্তিবাস। কবিকঙ্কণ ইহার বন্দনায় লিখিয়াছেন—'করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস। যাঁহা হইতে রামায়ণ হৈল প্রকাশ।'

কৃত্তিবাস নদীয়া জেলায় ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে। তাঁহার জন্মতারিখ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তিথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

বিদ্যারম্ভের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥

প্রায় আট বৎসর গুরুগৃহে অধ্যয়নের পর গৃহে ফিরিবার পথে তিনি ভাবিলেন একবার রাজার কাছে গিয়া বিদ্যাব পরিচয় দিয়া দেখি যদি বাজসম্মান লাভ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি তখনকার স্বাধীন বাংলার রাজধানী গৌড় নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌড়ের সিংহাসনে তখন রাজা গণেশ। রাজাব প্রশংসা করিয়া পাঁচটি শ্লোক বচনা করিয়া দ্বাররক্ষীর হাতে উহা বাজসকাশে পাঠাইয়া কবি অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। প্রাসাদে সাতটার ঘণ্টা বাজিলে দ্বারী আসিয়া বলিল, সাক্ষাতের অনুমতি মিলিয়াছে, চলুন। কবি দ্বারীর পিছু পিছু নয়টি দ্বার অতিক্রম কবিয়া বাজসভায় গিয়া হাজির হইলেন। রাজা হাতছানি দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন, কবি তাঁহার মাত্র চারিহাত ব্যবধানে গিয়া দাঁড়াইলেন। কবি এবাব স্বরচিত শ্লোক পাঁচটি নিজে আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে কবি তাঁহার নিকট হইতে কোন ধনরত্ন গ্রহণ করেন নাই, গ্রহণ করিয়াছেন শুধু পাটের জোড় আর মালা চন্দন। রাজ-নির্দেশে—

কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥

রাজা তাঁহাকে বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করার অনুরোধ করিলে তিনি রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া ঐ কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কৃত্তিবাস তাঁহার রচনায় বলিয়াছেন—

বাপ মায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচিত গীত সপ্ত কাণ্ড গান ॥

কৃত্তিবাসের রচিত কাণ্ডগুলির নাম আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা এবং উত্তর কাণ্ড। এখনকার মুদ্রিত গ্রন্থে এই সপ্ত কাণ্ডের অতিরিক্ত অনেক কিছু পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য ইহা পরবর্তী কবিদের কারসাজি।

এখানে কৃত্তিবাসের রচনা হইতে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে রাবণ বধের পর সীতা যখন অশোক বন ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন অশোক বনে কেমন শোকের বন্যা বহিতেছে তাহারই চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—

কুহু কুহু শব্দে কোকিল করএ রোদন।
মা ছাড়্যা গেলে আন্ধার হব অশোক বন ॥
ময়ূরগণ নৃত্য ছাড়ি করে হায় হায়।
ভ্রমর গুণ গুণ ছাড়ি লোটায় সীতার পায় ॥
সীতার চরণে ধরি কান্দেন সরমা।
দাসী করি সঙ্গে নেহ না করিহ ঘৃণা ॥

কৃত্তিবাসের পর অনন্ত কন্দলী, হরিশ্চন্দ্র, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, দুর্গারাম, রঘুনন্দন গোস্বামী, জগৎরাম, নিত্যানন্দ আচার্য, রামানন্দ ঘোষ, দ্বিজ সীতাসুত, কবি চন্দ্র, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি বহু কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনন্ত কন্দলী ছিলেন আসামের অধিবাসী, কিন্তু সে-যুগে বাংলা অসমীয়া ভাষায় তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। নিত্যানন্দ আচার্যের রামায়ণের নাম অদ্ভুত রামায়ণ। ইনি সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ হইতে কিছু কিছু কাহিনী লইয়াছিলেন। এইজন্য কবি অদ্ভুতাচার্য নামেই পরিচিত ছিলেন। কবি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। কবিচন্দ্রের

রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা অষ্টাদশের প্রথম। ইনি বিষ্ণুপুরের রাজসভার কবি ছিলেন। ইঁহার রচনা কৃত্তিবাসের রচনার মত জনপ্রিয় ছিল। মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ছিলেন মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। সপ্তদশ শতকের মধ্যে তিনি রামায়ণের কিয়দংশ রচনা করেন। চন্দ্রাবতীর জীবন ছিল বড় দুঃখময়। তাই তাঁহার রচনায় করুণ রস অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মহাভারত—ব্যাসের সুবিশাল সংস্কৃত কাব্য মহাভারত ঋষি জৈমিনী বেশ কিছুটা সংক্ষিপ্ত করিয়া যান, আর প্রধানতঃ এই জৈমিনী মহাভারত অনুসরণ করিয়াই বাংলার কবিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ মহাভারত কাব্য রচনা করিয়াছেন।

বাংলা মহাভারত বলিতে অবশ্য লোকে কাশীরাম দাসের মহাভারতই বুঝে—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তবে কাশীরাম দাসই বাংলা মহাভারতের একমাত্র বা সর্বপ্রথম রচয়িতা ন'ন। তাঁহার পূর্বে আরও অনেকে মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা মহাভারতের সর্বপ্রথম রচয়িতা খুব সম্ভব সঞ্জয়। সঞ্জয়ের পুঁথি পূর্ববঙ্গেই প্রচারিত বলিয়া, মনে হয় তিনি পূর্ববঙ্গেরই অধিবাসী ছিলেন। ইনি খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। সঞ্জয়কৃত মহাভারত হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। অংশটা যযাতির পতন সম্বন্ধীয়। অষ্টক যযাতির পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যযাতি উত্তরে বলিতেছেন—

যযাতি আমার নাম কহি শুনি তোক।
নহুষ নৃপতি সুত পুরুষ জনক॥

করিলে সুকৃতি নর যেবা নরে কয়।
নরকেতে বাস হয় পুণ্য হয় ক্ষয়॥
কহিলুম ইন্দ্রের ঠাঁই কথা সকল।
পুণ্য ক্ষয় হৈয়া মুঁই পড়িল ভূমিতল॥

সঞ্জয়ের পরেই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের নাম করিতে হয়। ইনি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর কবি। হুসেন শাহের লস্কর (প্রধান সেনাপতি) পরাগল খাঁয়ের আদেশে ইনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম ভারত পাঁচালি। গ্রন্থটিকে পরাগলী মহাভারত বলা হইয়া থাকে। পবাগল খাঁয়ের মহাভারত শুনিবার আগ্রহের সীমা ছিল না। কবি তাঁহার রচনার মাঝে কৃতজ্ঞচিত্তে একথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন—

লস্কর পরাগল গুণের নিধান
অষ্টাদশ ভারতে যাহার অবধান।
দানে কল্পতরু সে যে মহা গুণশালী
কুতূহলে করাইল ভারত-পাঞ্চালী।

পরাগলের পুত্র ছোট খাঁ বা নসরৎ খাঁও মহাভারত রচনায় পিতার মত সমান উৎসাহী ছিলেন। শ্রীকর নন্দী নামে এক কবিকে দিয়া মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বটির তিনি বিস্তৃত অনুবাদ করান। নন্দী কবি ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

ইঁহাদের পর যে-সকল কবি মহাভারত রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকপ্রীতি লাভ করিয়াছেন কাশীরাম দাস। কাশীরাম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহার কাব্য রচনা করেন। কবি তাঁহার আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন—

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।

ইন্দ্রানী পরগনা বর্ধমান জেলার পূর্বাপরে অর্থাৎ উত্তরে, ঐ পরগনার সিঙ্গিগ্রামে কবির জন্ম। কবি পরে মেদিনীপুর জেলার আউশগড়ের রাজবাড়িতে থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন। রাজবাড়িতে মহাভারতের কথকতা হইত, কবি প্রতিদিন তাহাই শুনিয়া আসিয়া তাঁহার মহাভারত রচনা করিতেন। কবি তাঁহার বংশের অন্যান্য সকলের মত নিজেও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে ইহার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়,—একটি যেমন—

পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥

কাশীরাম দাসের পরও বহু কবি মহাভারত রচনা করেন, কিন্তু কবিচন্দ্র, ষষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস সেন ছাড়া আর কেহই প্রায় সম্পূর্ণ আখ্যান রচনা করেন নাই। শেষোক্ত তিনজনই অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি।

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী

এখন হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বের নবদ্বীপ। তখনকার দিনের বাংলার প্রসিদ্ধতম বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপ,—এখন যেমন কলিকাতা।

নবদ্বীপ সমৃদ্ধি কে বর্ণিবারে পারে,
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়,
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়,
লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।

নবদ্বীপের এই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া এইখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহারই পুত্র, মাতার নাম শচী দেবী, জন্মকাল ১৪০৭ শক অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যা। তখন আবার চন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছিল, তাই চারিদিকে হইতেছিল শঙ্খঘণ্টা হুলুধ্বনি।

শচীদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের পর শচীদেবীর পরপর সাতটি কন্যাসন্তান অল্প বয়সেই মারা যায়, এইজন্য চৈতন্যদেব ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখা হয় নিমাই। ভাল নাম বিশ্বম্ভর। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ষোল বৎসরের সময় সন্ন্যাসী হইয়া যান, জগন্নাথ মিশ্র তাই ভয়ে নিমাইএর পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার যুক্তি হইল—'এই যদি সর্বশাস্ত্রে হবে

গুণবান। ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়াণ॥ অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাই। মূর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥'

বালক নিমাই বাড়িতে, গঙ্গার ঘাটে, সর্বত্রই নানা প্রকার দুষ্টামি, অনাসৃষ্টি কার্য শুরু করিলেন। একবার আস্তাকুঁড়ের হাঁড়ির উপর বসিয়া পাগলামি সুরু করিলে, শচীদেবী যখন ভৎসনা করিলেন, তখন শিশু নিমাই উত্তর করিলেন,—'প্রভু বলে মোরে তোরা না দিস পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কি মতে।' ইহার পর বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে দেওয়া হইল। দুরন্ত নিমাইয়ের পড়াশুনায় একাগ্রতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। 'পুঁথি ছাড়িয়া নিমাঞি না জানে কোন কর্ম। বিদ্যারস ইহার হয়েছে সর্বধর্ম।' অসাধারণ মেধা বলে অতি অল্পকালের মাঝেই ব্যাকরণ শেষ করিয়া তিনি কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতিতেও সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ইহার পর মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি নবদ্বীপে এক টোল খুলিয়া বসিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া নানাস্থান হইতে তাঁহার টোলে ছাত্র আসিতে লাগিল। ইহার পূর্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু এবং লক্ষ্মীদেবী নামে এক সুলক্ষণা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

এই সময় কেশব কাশ্মীর নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া ওখানকার পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলে নিমাই তাঁহার রচিত শ্লোকে অলঙ্কার শাস্ত্রের নানা দোষ দেখাইয়া পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ করিলেন।

এদিকে আবার তাঁহার উদারতার তুলনা ছিল না। ন্যায়ের টীকা হাতে একবার গঙ্গা পার হইবার সময় একদিন নিমাই দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার পুঁথির দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নিমাই

উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি একখানা ন্যায়ের টীকা লিখিয়াছি, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকা পাইলে কেহ কি আমার টীকা পড়িবে? নিমাই তখনই তাঁহার টীকা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিলেন।

এই সময় তিনি একবার পূর্ববঙ্গ পরিক্রমায় বাহির হন। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্প দংশনে মারা গিয়াছেন। জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু প্রথমা পত্নীর বিয়োগবেদনা তিনি হয়তো ভুলিতে পারেন নাই।

ইহার পর পিতৃকার্যে গয়ায় গিয়া বিষ্ণু পাদপদ্ম দেখিতে দেখিতে নিমাই কেমন যেন হইয়া গেলেন, ভাবাবেগে তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছাভঙ্গেও তিনি কি দেখিয়াছেন ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার মুক্তাদামসম উজ্জ্বল অশ্রুধারায়। ঐ খানেই ঈশ্বরপুরী নামক বৈষ্ণব সাধুর নিকট হইতে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি 'হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। নবদ্বীপে আসিয়াও দিবারাত্র শুধু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিতে লাগিলেন। পড়াইতে পারেন না, টোল উঠিয়া গেল। প্রতিবেশী ভক্তবৈষ্ণব শ্রীবাসের আঙিনায় সারা রাত্রি তিনি হরিনাম কীর্তন করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেমের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে নিত্যানন্দ, হরিদাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে রাজপথেও মহোদ্যমে কীর্তন চলিতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়'। কিন্তু ইহাতেও নিমাইয়ের প্রাণের ক্ষুধা মিটিল না, একদিন রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষা

লইলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ বৎসর। সন্ন্যাসের পর নাম হইল তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

ইহার পর তিনি নীলাচলে অর্থাৎ পুরী যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন ধর্মবন্ধুও তাঁহার সঙ্গে যান। পুরীতে গিয়া জগন্নাথের মূর্তি দর্শন করিয়া তিনি ভাবাবেগে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, পরে হরিনাম শুনাইলে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে।

চৈতন্যদেব পুরীতেই তাঁহার স্থায়ী আবাস স্থির করিয়া নিত্যানন্দকে দেশে ফিরিয়া হরিনাম প্রচার করিতে বলেন।

পুরীতে কিছুদিন কাটাইয়া চৈতন্য একটি মাত্র সহচর সঙ্গে লইয়া ভাবত-ভ্রমণে বাহির হ'ন। প্রথমে তিনি দক্ষিণভাবত ও গুজরাট ঘুরিয়া আসেন। পরে একবার গৌড় অবধি গিয়া ফিরিয়া আসেন, ইহার পর কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন দেখিয়া ছোটনাগপুরের গহন অরণ্যপথে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই তিন দফাব পর্যটনে ছয় বৎসর কাটিয়া যায়। জীবনের শেষ আঠারো বৎসর তিনি আর পুরী ত্যাগ করেন নাই।

চৈতন্যের দেশ পর্যটন সার্থক হয় তাঁহার প্রেমধর্ম বিস্তারে। অন্ধ্রের মন্ত্রী রামানন্দ রায়, স্থলতান হোসেন শাহের দুই মন্ত্রী রূপ ও সনাতন চৈতন্যের প্রেমধর্মে আকৃষ্ট হইয়া সংসার ত্যাগ করেন।

জীবনের শেষ কয় বৎসর চৈতন্য সর্বদাই ভগবৎ-প্রেমাবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। পুরীর সমুদ্রের নীল জল দেখিয়া কৃষ্ণভ্রমে তিনি অনেক সময় উহা আলিঙ্গন করিতে যাইতেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে সকলের অলক্ষ্যে ঐরূপ করিতে গিয়াই তিনি হয়তো অনন্ত সাগর-বুকে লীন হন।

শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশাতেই তাঁহার লীলামধুর দিব্যজীবন লইয়া কাব্য

নাটক রচনা শুরু হইয়া যায়। প্রথমে তাঁহাকে লইয়া কয়েকখানি সংস্কৃত জীবনীকাব্য ও নাটক রচিত হয়। উহাদের নাম—মুরারী গুপ্তের কড়চা, কবি কর্ণপুরের তিনখানি গ্রন্থ—চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ও গৌরগণেশোদ্দীপিকা, ইহা ছাড়া স্বরূপ দামোদরের কড়চা।

চৈতন্যের জীবন লইয়া বাংলাভাষায় প্রথম যে-গ্রন্থ রচিত হয়, অনেকের মতে তাহার নাম গোবিন্দ দাসের কড়চা। গোবিন্দ দাস জাতিতে কর্মকার ছিলেন, সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের কিঞ্চিদধিক একবৎসর পূর্বে তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। চৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনের প্রথম দিকে তাঁহার সেবকরূপে তিনি তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হন গোবিন্দ দাস তখনও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব হইতে শুরু করিয়া এই কাল পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন তাহার সবকিছুই তিনি সংক্ষেপে তাঁহার কড়চায় (notes) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গুর্জরী নগরে প্রভুর প্রেমাবিষ্ট অবস্থা দেখিয়া সকলে কেমন মুগ্ধ হইয়াছিল তাহার বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥
বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥
পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া।
শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া॥

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন এই কড়চাখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, এখনকার অনেক পণ্ডিতই কিন্তু গ্রন্থখানি সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের ভাব পোষণ করেন।

যাহা হউক, ইহার পর চৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে যে-গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার নাম চৈতন্যমঙ্গল,—রচয়িতার নাম জয়ানন্দ। জয়ানন্দের জন্মকাল ১৫১১ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। জয়ানন্দের গ্রন্থে চৈতন্যদেব সম্পর্কিত অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান মিলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার তিরোধান সম্বন্ধেই বলা যায়। চৈতন্যের তিরোধান সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত, কিন্তু জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আষাঢ় মাসে একদিন কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার পদ ইষ্টকবিদ্ধ হয়; দুই একদিনের মধ্যে বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন, এবং সপ্তমী তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁহার লেখায় তৎকালীন ঐতিহাসিক ব্যাপার জানা যায়। চৈতন্যের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপে যে নানা গোলযোগ দেখা দেয় তাহার বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতিপ্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয়ে তার জাতিনাশ করে॥

চৈতন্যজীবন লইয়া যে-সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইতেছে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত।

চৈতন্যভাগবত মহাপ্রভুর তিরোধানের পরবর্তী কালে রচিত হয়। বৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থের এক জায়গায় ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন—'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন।' চৈতন্যদেবকে তিনি স্বচক্ষে না দেখিলেও নিত্যানন্দের মুখে তিনি সবকিছুই শুনিয়াছেন এবং তাঁহারই

আদেশে মহাপ্রভুর তিরোধানের চল্লিশ বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের বয়স তখন আটত্রিশ।

চৈতন্যভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের ছাঁচে গড়া। চৈতন্যলীলা কৃষ্ণলীলার পুনরাবৃত্তি—ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কবি যত্নপর হওয়ায় মাঝে মাঝে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

চৈতন্য ভাগবত তিন খণ্ডে বিভক্ত,—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদি খণ্ডে চৈতন্যদেবের গয়াগমন পর্যন্ত, মধ্য খণ্ডে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং অন্ত্য খণ্ডে মহাপ্রভুর নীলাচল বাসের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের প্রথম জীবন অতি সুন্দর এবং বিশদরূপে বর্ণিত হইলেও তাঁহার শেষ জীবনের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। চৈতন্য ভাগবতেব ইহাই একমাত্র ত্রুটি।

চৈতন্য ভাগবত শুধু বৈষ্ণব ভক্ত নয়, তথ্যজিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের নিকট পর্যন্ত পরম আদরণীয়, কারণ মহাপ্রভুর দিব্যমধুর লীলা ছাড়া ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তৎকালীন বঙ্গদেশের—বিশেষ করিয়া নবদ্বীপ-সমাজ ও সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল চিত্র। গ্রন্থ সরল ভাষায় সহজ পয়ারছন্দে রচিত হওয়ায় সাধারণের বোধগম্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায় প্রারম্ভ হইতেই কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥
নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥

ইহার পর চৈতন্য জীবনীমূলক গ্রন্থ হইতেছে লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল। কবি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গুরু নরহরি সরকারের আদেশে ইহা রচনা করেন। লোচন দাস পদকর্তা কবি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার রচনা কবিত্বে পূর্ণ, কিন্তু অলৌকিকতার প্রাধান্য থাকায় শ্রীচৈতন্যের বাস্তবরূপ ইহাতে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

চৈতন্য জীবনীমূলক সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বৃদ্ধবয়সে কবি ইহা রচনা করেন। কৃষ্ণদাস তখন বৃন্দাবন বাস করিতেছিলেন। রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, ভূগর্ভ গোসাঞি ইত্যাদি সকলেই তখন বৃন্দাবনবাসী। সন্ধ্যায় প্রতিদিন চৈতন্যভাগবত পাঠ হইত। কিন্তু ইহাতে মহাপ্রভুর শেষ জীবনের বিশদ বর্ণনা নাই দেখিয়া তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণদাসকে উহা করিতে অনুরোধ করেন। কবি চৈতন্য-বিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া এবং বৈষ্ণবাচার্যদের নিকট হইতে মৌখিক বৃত্তান্ত শুনিয়া নয় বৎসরের চেষ্টায় ৮৫ বৎসর বয়সে এই গ্রন্থরচনা শেষ করেন। বৈষ্ণবাচার্য-গণ গ্রন্থখানির অনুমোদন করিলে উহা গৌড়ে প্রেরিত হইতেছিল, পথে বনবিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীরের অনুচর দস্যুগণ উহা অপহরণ করে। এই সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছিলে বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী আর জীবনধারণ করিতে পারিলেন না। গ্রন্থখানির অবশ্য পুনরুদ্ধার হয়।

চৈতন্যের দিব্য জীবন-চিত্র ছাড়া কৃষ্ণদাসের সাধারণ বিনয়, প্রেমভক্তি, পাণ্ডিত্য যেন গ্রন্থখানির সর্বত্র ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কবি তাঁহার রচিত মহাপ্রভুর জীবনচরিত পাঠকদের প্রতি বিনয় করিয়া বলিয়াছেন—

চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করো মুঞি পানে।

শেষের দিকে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ অবস্থায় কাল কাটাইতেন,

তাঁহার তখন যে-চেহারা হইয়াছিল দক্ষ চিত্রকরের মত কৃষ্ণদাস লেখনীর এক আঁচড়ে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

চর্ম মাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হইয়া।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া॥

শেষের দিকেও মায়ের কথা চৈতন্য ভুলিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতে তাঁহারই মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ॥
এইরূপ অপরাধ তুমি না লইও আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার॥

গীতিসাহিত্য

'কীর্ত্তন আর বাউলের গানে আমরা দিয়াছি খুলি,
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।'

—সত্যেন্দ্রনাথ

'কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥'

—অতুলপ্রসাদ

বাংলা গানে সত্যই যাদু মিশানো আছে, নইলে বাংলা গান গাহিয়া এবং শুনিয়া বাঙালী এমন আত্মহারা হয় কেন? বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি, অনুভূতি তাহাদের যেমন তীব্র গভীর তেমনি সূক্ষ্ম। এই অনুভূতি প্রকাশ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় একমাত্র গান, কারণ ভাষায় যাহা সম্পূর্ণ

ব্যক্ত হইতে পারে না সুরে তাহা ব্যক্ত হইয়া যায়। গান মনের গোপন নিভৃত ভুবনের দ্বার খুলিয়া দেয়। আবার শিল্পের প্রতিশাখাতেই দেখা যায় শুরু হইয়াছে তাহা প্রথমে ধর্মের ব্যাপার লইয়া, শুধু এই দেশে নয়, প্রতি দেশে। বাংলার গীতি-সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। বাংলার বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ, সবই ধর্মসম্বন্ধীয়। এখন একে একে উহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে-দুইটি নূতন শাখা প্রাণপ্রাচুর্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহার একটি হইতেছে জীবনীসাহিত্য, আর একটি বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্য। জীবনী-সাহিত্যের কথা পূর্বাধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, এখানে বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। বৈষ্ণবপদ রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান। চৈতন্যদেবের বহুপূর্বেই কবি জয়দেব সংস্কৃতে রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়া সুমধুর পদ রচনা করেন। তাঁহার রচনা সংস্কৃতে হইলেও উহা বাংলারই কাছাকাছি—যেমন,—'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী,'—অথবা 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,'—ইত্যাদি। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বাঙালী ছাত্রগণ মিথিলায় ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িতে যাইত, তখন মিথিলায় একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন, নাম ছিল তাঁহার বিদ্যাপতি। মৈথিলী ভাষায় রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে বিদ্যাপতি অনেক মধুর পদ রচনা করেন। একে বাঙ্গালী রাধাকৃষ্ণের লীলা কাহিনী শুনিতে উৎসুক, তাহার উপর মৈথিলী ভাষার শ্রুতিমাধুর্য

ও কবি বিদ্যাপতির রচনা চাতুর্য,—বাঙালী ছাত্রগণ শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে ফিরিলে দেখা যাইত, তাহাদের মুখে মুখে বিদ্যাপতির পদাবলী। ক্রমে বাংলাদেশের পদকর্তাদের অনেকেও এই ভাষাতেই তাঁহাদের পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাষার নাম দিলেন তাঁহারা ব্রজবুলি। জনসাধারণ মনে করিতে লাগিল, ইহা ব্রজ অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভাষা, ফলে এই ভাষাকে তাহারা পবিত্র দেবভাষা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। বস্তুতঃ ইহাতে ব্রজকিশোরের লীলাকাহিনী বর্ণিত হইলেও ইহা ব্রজের ভাষা নয়। বাংলার পদকর্তাদের ব্রজবুলিতে ক্রমে অবশ্য অনেক বাংলা এমন কি হিন্দি শব্দও প্রবেশ করিয়া ইহাকে একটি কৃত্রিম মিশ্র ভাষাতে পরিণত করিয়াছে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথও বালক বয়সে এই ভাষাতে তাঁহার ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙালী পদকর্তারা তাঁহাদের ব্রজবুলিতে পদ রচনার জন্য বিদ্যাপতির কাছে ঋণী বুঝিয়া বিদ্যাপতির ভাষা ও তাঁহার কোন পদ শুনিতে স্বতঃই তোমাদের আগ্রহ জাগিবে। তাঁহার ভাষা ও পদের কিছু উদাহরণ দিতেছি।

হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবি মাহে ॥
অঙ্কুর, তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥

বিদ্যাপতির উপমাগুলিও অনবদ্য সুন্দর: 'লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার। মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার ॥'—অথবা—'চঞ্চল লোচনে

বঙ্ক নেহারনি, অঞ্জন শোভন তায়। জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল, অলি ভরি উলটায়।"

বিদ্যাপতির পরে যে-সকল বাঙালী কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া নাম করিতে হয় চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, রায় শেখর, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, নরহরি দাস প্রভৃতির।

চণ্ডীদাস যে বাংলা পদাবলী সাহিত্যের আদি এবং শ্রেষ্ঠ কবি সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ চণ্ডীদাস কিন্তু অনেকের মতেই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ন'ন। ইনি নিজেকে দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাবের গভীরতা এবং আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে আর কোন বৈষ্ণব কবিই ইহার সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হন না। তাহা ছাড়া ইঁহার ভাষা অতি সহজ, সরল, মর্মস্পর্শী। একটি নমুনা—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥

চণ্ডীদাসের রাধা যেন এক মহাযোগিনী, বৈরাগ্য ও দুশ্চর তপস্যায় মহীয়সী। শ্রীরাধার পূর্বরাগ পদে চণ্ডীদাস তাঁহার এই মূর্তিটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পদটি এইরূপ—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনীপারা॥

চণ্ডীদাসের পরেই নাম করিতে হয় জ্ঞানদাসের। জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পদ রচনায় ইনি চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদের মত ইঁহার পদ ভাবসমৃদ্ধ, করুণ, মর্মস্পর্শী। ভাষা তাঁহারই মত সহজ —সাধারণের বোধগম্য। একটি পদের উদাহরণ—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি হে কি মোর করমে লিখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদে সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি মরণ-অধিক শেল॥

জ্ঞানদাস ব্রজবুলিতেও পদরচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পাণ্ডিত্য ও রচনাপারিপাট্য মিলিলেও তৎরচিত বাংলা পদের মত উহা হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে নাই।

জ্ঞানদাস যেমন চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়াছেন গোবিন্দদাস করিয়াছেন তেমনি বিদ্যাপতির, সেই জন্য ইহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হইয়া থাকে। ইনিও ষোড়শ শতাব্দীর কবি। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির

অনুসরণ করিলেও কবি হিসাবে স্থান তাঁহার বিদ্যাপতি অপেক্ষা খুব নিম্নে নহে। 'মৈথিল কবির পদে অনুভবের গাঢ়তা ও উদ্দীপনাশক্তি বেশি, কিন্তু গোবিন্দের পদে স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক।' ভাষা ব্রজবুলি। একটি পদের নমুনা—"যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাত॥ সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥ যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গজ্যোতি হোই তথি মাহ॥……যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম। মজু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥ গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরি। সো মরকত তনু তোহে কি এ ছোড়ি॥'

গোবিন্দ দাসের শ্রীরাধা সাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের অভিসারে যাইবার জন্য নিজেকে কেমন কঠোর সাধনার দ্বারা প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছেন নিম্নোক্ত পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি।
……দূরতর পন্থগমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি॥……

চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসও খুব উঁচুদরের পদকর্তা ছিলেন। রাধাকৃষ্ণের লীলা ও গৌরাঙ্গ লীলার পদ রচনায় তিনি সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহার অনেক পদেরই ভাষা, ছন্দ ও ভাবের মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। একটি উদাহরণ—"…(বঁধু) তোমায় যখন পড়ে মনে (আমি) ধাই বৃন্দাবন পানে, এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি। রন্ধন শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥ কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো, তাহে পরিজন-পরিবাদ। বাজননূপুর হয়ে চরণে রহিব গো, লোচনদাসের এই সাধ॥"

বৈষ্ণব পদাবলী যে কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী লইয়াই রচিত তাহা নহে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসেরও উল্লেখ আছে, ইহার প্রত্যেকটি অবলম্বন করিয়াই পদ রচিত হইয়াছে। পদকল্পতরু নামক পদাবলী-সংকলন গ্রন্থে এই বিভিন্ন রসের ত্রিসহস্রাধিক পদ পর্যায়ক্রমে সাজানো আছে। বৈষ্ণব পদে বাৎসল্য রস কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে—দ্বিজ শ্যামদাসের রচনা হইতে একটি উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখানো যাইতেছে—

পাখানি নাচাইয়া নূপুর বাজাইয়া বসিয়া মায়ের কোলে।
ঈষৎ হাসিয়া মাখন তুলিয়া আধ আধ বাণী বোলে॥
কাঁচা মরকত নবনী-জড়িত মনোহর তনুখানি।
হাসিয়া হাসিয়া অমিয়া সিঞ্চিয়া বোলে আধ আধ বাণী॥
যাহা লাগি শিব ছাড়ি নিজ বৈভব বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়।
দ্বিজ শ্যামাদাসে বলে সেই গোপাল কুতূহলে নন্দগৃহে ধূলায় লোটায়॥

বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ মাথুর বা বিরহ। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়া রাজা হইয়াছেন। কৃষ্ণের বিবহে শ্রীরাধার অবস্থা অতীব শোকাবহ। বৈষ্ণব কবি রচনাগুণে শ্রীরাধার এই বিরহ-বেদনা বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

সজনি জানলু কঠিন পরাণ॥
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি শুনইতে নাহি বাহিরান।

কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের মতে বিরহেই প্রেমের অবসান নয়,— ভাব-সম্মিলন পদে তাঁহারা ভাবলোকে রাধাকৃষ্ণের মিলন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদে শ্রীরাধা ভাবলোকে শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইয়া বলিতেছেন—

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিধি মোহে অনুকূল হোয়ল টুটল সব সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকয়ু লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হুউ মলয়-পবন বহু মন্দা।

চৈতন্যদেবের জীবন ও মহিমা যতই জনসমাজে প্রচারিত হইতে লাগিল, ততই লোকের শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহার উপর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শেষে বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাকেই কৃষ্ণের অবতাররূপে মনে করিতে লাগিলেন, ফলে রাধাকৃষ্ণের লীলার মত চৈতন্যলীলা লইয়াও পদ রচিত হইতে লাগিল। যেমন—

হরি হরি গোরা কেন কান্দে।
নিজ সহচরগণ পুছই কারণ হেরই গোরা মুখ চান্দে॥
অরুনিত লোচন প্রেমভরে ভেল ডুন ঝরঝর ঝরে প্রেমবারি।
ঐছন শিথিল গাঁথল মতিফল খসয়ে উপরি উপরি॥

ক্রমে বৈষ্ণব পদকর্তারা গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণে অভেদ দেখাইতে কৃষ্ণলীলার কোন পালা রচনা করিবার সময় সর্বপ্রথমে গৌরাঙ্গের অনুরূপ ভাবের লীলা বর্ণনা করিয়া লইতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহাকে বলা হয় গৌরচন্দ্রিকা। এই পদে গৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়াই বুঝা যাইত কৃষ্ণের কোন লীলা আজ গাওয়া হইবে।

শাক্তপদাবলী—বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গা-তীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল। প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষোভশালিনী—মৃদুপবনহিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল।......

আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের

রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না।........কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময় গঙ্গাবক্ষ হইতে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

সাধো আছে মা মনে,
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী জীবনে॥

তখন প্রাণ জুড়াইল, মনের সুর মিলিল, বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম···।" বাস্তবিকই বাঙ্গালীর মনের আশা, প্রাণের কথা শুনিতে হইলে শাক্ত সঙ্গীতের মত বুঝি আর কিছু নাই। মা-গঙ্গার পলিমাটি মাতৃস্নেহের মত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া বাঙ্গালা দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি মাতৃস্নেহে তাহার সন্তানগণকে লালনপালন করিতেছে, তাই এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মূলীভূত কারণকে মা বলিয়াই বুঝি ডাকিতে ইচ্ছা করে। এই জন্যই শাক্তপদ বাঙ্গালীর এত প্রিয়।

শাক্তপদের আদি রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামপ্রসাদ সেনই যে ইহার প্রধান রচয়িতা এবং প্রবর্তক সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদের মত তাঁহার পিতা ও পিতামহও শক্তির উপাসক ছিলেন। রামপ্রসাদ বাংলা সংস্কৃত ছাড়া ফারসী ভাষাও কিছুটা জানিতেন। বালক বয়সেই তাঁহার মধ্যে ভক্তির সঙ্গে কবিত্বের স্ফুরণ দেখা যায়।

শোনা যায় যৌবনে জীবিকা অর্জনের জন্য এক ধনী জমিদার-

সেরেস্তায় তিনি মুহুরিগিরির কাজ গ্রহণ করেন। একদিন জমিদার সেরেস্তা পরিদর্শনের সময় দেখেন মুহুরির খাতায় লেখা রহিয়াছে—'আমায় দে মা তবিলদারি। আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী।'—ইত্যাদি পদ। বিমুগ্ধ জমিদার তাঁহাকে ত্রিশ টাকা বৃত্তি দিয়া ছুটি করিয়া দিলেন, বলিলেন, ঘরে বসিয়া তুমি শ্যামা-সংগীত রচনা কর। ইহার পর রামপ্রসাদ ঘরে ফিরিয়া তাঁহার অবশিষ্ট জীবন আধ্যাত্মিক সাধনা এবং শাক্তপদ রচনা করিয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি এবং একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। শোনা যায় নবাব সিরাজদ্দৌলাও তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

রামপ্রসাদের পদগুলিকে দুই পর্যায়ে ফেলা যায়। এক—শ্যামাসঙ্গীত বা আধ্যাত্মিক সাধনার গান; দুই—আগমনী, বিজয়ার গান। জগজ্জননীকে মা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার নিকট নানাপ্রকার আবদার, প্রার্থনা, তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা এবং মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনা করা যাইতে পারে ইহা আমরাও বুঝিতে পারি, কিন্তু শাক্তপদের ভিতরেও যে বৈষ্ণবসাধনানুগামী বাৎসল্য রস সৃষ্টি সম্ভব—ইহা আবিষ্কার বুঝি শুধু রামপ্রসাদের মত প্রতিভাশালী সাধক কবির দ্বারাই সম্ভব। বাৎসল্যরস অনুভূতির জন্য বৈষ্ণবদের আছেন গোপাল—কিন্তু শাক্তদের—শাক্তদের কি আছে? শাক্তেরা ত শুধু ঈশ্বরকে জননীরূপেই উপাসনা করিবার সুযোগ পান। কিন্তু রামপ্রসাদ আবিষ্কার করিলেন এই সুযোগ শাক্তদেরও আছে। জগজ্জননী আদ্যাশক্তিই হিমালয়ের ঘরে মেনকার কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ অমনি শাক্তপদে বাৎসল্যরসের স্রোত বহাইলেন। সে-যুগে এ-দেশের পিতা-মাতা আট বৎসরের শিশুকন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠাইয়া বিরহাকুল চিত্তে

দিন কাটাইতেন। কন্যার আসিবার সময় তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না,—আবার বিদায় দিবার সময় তাঁহাদের বুক ফাটিয়া যাইত। সমাজজীবনের এই তীব্র অনুভূতিই আগমনী বিজয়া গানে এমন প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছে। রামপ্রসাদের নিকট আগমনী গানে আমরা পাই—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না॥

এ-গান শুনিয়া কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না, ঠাকুর-দেবতা লইয়া কথা হইলেও এ অতীত বাংলার মাতৃহৃদয়েরই ছবি।

রামপ্রসাদের অনুসরণ করিয়া পরে অন্যান্য কবিরাও আগমনী গান রচনা করিয়াছেন। নিম্নে আর একজন বিশিষ্ট শাক্তপদ রচয়িতা কমলাকান্তের একটি পদের কিয়দংশ এইরূপ—

গিরি প্রাণগৌরী আমার।
উমা-বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে অন্ধকার॥
আজিকালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে ?
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, এ কি তব পরিচয় !

বিজয়া গান বিদায়ের গান। আসন্ন কন্যা-বিচ্ছেদ ব্যথায় অধীর জননীহৃদয় যেন এ-গানে কাঁদিয়া ফাটিয়া পড়িতে চায়—

যেয়ো না রজনী, আজি লয়ে তারা দলে।
গেলে তুমি দয়াময়ী, এ পরাণ যাবে॥
উদিলে নিদয় রবি—উদয় অচলে।
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে॥ —মধুসূদন

রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীতের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল সহজ সরল ভাষায় নিতান্ত ঘরোয়া উপমা দিয়া জীবনের সুগভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ। পথে ঘাটে যখন আমরা সাধারণ লোকের কণ্ঠে শুনি,—'মনরে কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা' অথবা—'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখঢাকা বলদের মত'—তখন আমরা বুঝি রামপ্রসাদ পদগুলির ভিতর দিয়া সাধন-রাজ্যের যে-কথা বলিতে চাহিয়াছেন বাংলার ঐ প্রায়-নিরক্ষর লোকগুলিরও তাহা বোধগম্য হইতেছে। ঐ গান গাইবার জন্যও রামপ্রসাদ বাংলা বাউল ভাটিয়াল প্রভৃতি গ্রাম্য সুরের মিশ্রণে একটি সহজ সুর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নামানুসারে ইহার নামই হইয়াছে রামপ্রসাদী সুর।

রামপ্রসাদ এবং তাঁহার পববর্তী কালের শাক্তপদ রচয়িতাদের সাধন-সঙ্গীতগুলি যে যে বিষয় অবলম্বনে রচিত মোটামুটি তাহার একটা পরিচয় দেওয়া যায়,—যেমন জগজ্জননী রূপ, তাঁহার স্বরূপ, ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা, ইচ্ছাময়ী মা, লীলাময়ী মা, নামমহিমা, সাধনশক্তি, চরণতীর্থ ইত্যাদি। আকুতি জানাইতে রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করি ছলো।
ও মা, মিঠার লোভে, তিতো মুখে সারাদিনটি গেল॥

(কুমার) নরচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—

মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা সর্বনাশী বেঁচে নাই॥

মনকে দীক্ষিত করিতে কমলাকান্ত লিখিয়াছেন—

আপনারে আপনি দেখ, যেয়ো না মন কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥
পরমধন পরশমণি— যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে ॥

মায়ের স্বরূপ বর্ণনায় এই কবিই লিখিয়াছেন—

সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি ॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশিভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া রামপ্রসাদ কমলাকান্ত ছাড়া আরও যত কবি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি শাক্তপদ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নাম দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। কেবল বিশেষ বিশেষ কয়েক-জনের নাম হইতেছে—দাশরথি রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রসিকচন্দ্র রায়, (মহারাজ) রামকৃষ্ণ রায়, (কুমার) নরচন্দ্র রায়, কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ, মহারাজ নন্দকুমার রায়।

এই সঙ্গে এ-যুগের কবি কাজি নজরুলের নামটি উল্লেখ না করিলে একটা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। তাঁহার রচিত 'বল রে জবা বল'—এবং 'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী'—গান দুইটি শুধু উত্তম সুরে গীত জনপ্রিয় গান নয়, ভক্তিরসাশ্রিত উচ্চ ভাবোদ্দীক পদ।

২য় খণ্ড

বাংলা গদ্যের অনুশীলন

ইউরোপীয় মিশনারী ও বাংলা গদ্য—সর্বদেশেই সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ পদ্যে। আদি কবি বাল্মীকির প্রথম উচ্চারিত বাণী কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন --"পৃথিবীব আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দ তরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।" চর্যাপদ বচনাকাল হইতে শুরু করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যেরও প্রতি শাখাতেই দেখি কেবল কবিতারই রাজত্ব। গদ্য রচনাব সামান্য নিদর্শন মিলে শুধু চিঠিপত্র বা দলিল দস্তাবেজে,—সাহিত্যে নয়।

সাহিত্যে বাংলা গদ্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দোম আন্তোনিও লিখিত 'ব্রাহ্মণ রোমন ক্যাথলিক সংবাদ' নামক এক খৃষ্টধর্ম প্রচারাত্মক গ্রন্থে। দোম আন্তোনিও ছিলেন বাঙালী, ভূষণার জমিদার-পুত্র। মগ দস্যুরা তাঁহাকে হরণ করিয়া আরাকানে লইয়া গেলে ওখানকার এক পর্তুগীজ পাদবি তাঁহাকে টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। দোম আন্তোনিওর রচনার একটু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'রামের এক স্ত্রী, তাহার নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ, তাহার ভাই লকন, রাজা অযোধ্যা বাপের সত্য পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহার স্ত্রীরে রাবণ ধরিয়া লিয়া ছিলেন, তাহার নাম সীতা।'

ইহার পরে গদ্যে প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’। ইহার রচয়িতাও পর্তুগীজ পাদরি, নাম মানো এলদা আস্‌সুম্পাসাঁও। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। গ্রন্থখানি রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে প্রকাশিত হয়। রচয়িতা ভাওয়ালের পর্তুগীজ গির্জায় থাকিতেন, ফলে ভাষায় ঐ অঞ্চলের ছাপ পড়িয়াছে, রচনা রীতিতে রহিয়াছে পর্তুগীজ প্রভাব। ইহার রচনার একটু নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হইল—

‘ঠাকুর’ পরাজয় হইয়াছি আমারে জিনিলা, আর কি চাই? খ্রীস্তর লাগিয়া আমাকে মাফ কর, তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেন: জিননিয়া কহিল।’

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে ইংরেজ ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাব হইল। গঙ্গাতীবে শ্রীবামপুবে তাঁহাদেব ধর্মপ্রচাবকেন্দ্র স্থাপিত হইল। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁহারা বাংলাভাষার চর্চা শুরু করিলেন। ইহাদের প্রধান দুইজন কর্মী হইলেন জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী, এবং এই দুইজনেব সহযোগী হইলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জসুয়া মার্শম্যান।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীবামপুবে ইহারা ব্যাপটিস্ট মিশন নামে একটি খৃষ্টধর্ম প্রচার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া প্রথমেই বাইবেলেব বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলেন। ক্রমে ইঁহারা বাংলায় যীশুর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য ও প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। বাংলা সংবাদপত্রও এইখান হইতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় সংবাদ অবশ্য অতি কমই থাকিত। কেরী বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও বাংলা ইংরেজি একখানা অভিধান প্রণয়ন করেন,—ইহা ছাড়া ‘কথোপকথন’ নামে বাংলা কথ্য ভাষায় একখানা গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। শ্রীরামপুর

মিশনের মুদ্রা যন্ত্র হইতেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়া সর্বসাধারণের অনায়াসলভ্য হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

ইংলণ্ড হইতে আই. সি. এস. পাস করিয়া যে-সকল ইংরাজ কর্মচারী এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে আসিতেন তাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষা এবং রীতিনীতিতে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে খৃষ্টীয় ১৮০০ অব্দের মে মাসে ইংরেজ সরকার একটি শিক্ষায়তন খুলিলেন, ইহারই নাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। বলাবাহুল্য এই শিক্ষায়তনটি জনসাধারণের জন্য নয়।

শ্রীরামপুর মিশন হইতে বাংলা বাইবেল প্রকাশের পর উইলিয়ম কেরীর বাংলাজ্ঞানের খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সরকার কেরীকেই এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। বাংলা গদ্যে তখন পড়িবার মত কোন বই ছিল না, তাই কর্মভার গ্রহণ করিবার পরই কয়েকজন বাঙ্গালী পণ্ডিতকে কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা গদ্যে পাঠ্য পুস্তক রচনা করাইতে লাগিলেন। কেরীর অধীনে যিনি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, নাম তাঁহার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি লিখিলেন— বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলী ও প্রবোধচন্দ্রিকা। পণ্ডিত রামরাম বসু ছিলেন কেরীর মুন্‍শি, তাহা ছাড়া তাঁহার বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক। তিনি লিখিলেন প্রতাপাদিত্য চরিত ও লিপিমালা। এই দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছাড়া কলেজে আরও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মধ্যে চণ্ডীচরণ মুন্‍শি লিখিলেন তোতা ইতিহাস, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লিখিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্, হরপ্রসাদ রায় লিখিলেন পুরুষ পরীক্ষা।

বলা বাহুল্য এই সব গ্রন্থের ভাষা আধুনিক বাংলার মত সরল, সুখপাঠ্য ছিল না, অধিকাংশ স্থানে হয় আরবী, ফারসী না হয় সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কণ্টকিত। রামরাম বসু ভাল ফারসী জানিতেন, সুতরাং তাঁহার রচনায় ফারসী শব্দেরই প্রাধান্য। আবার অপর পক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সংস্কৃত শব্দ ও সমাসে কণ্টকাকীর্ণ।

গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে কেরীও এই সময় বসিয়া ছিলেন না, তিনিও কথোপকথন ও ইতিহাসমালা নামে দুইখানা বই লিখিলেন।

মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা—খৃষ্টীয় ১৮০০ অব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপিত হইলে ঐখান হইতে ঐ সালেই বাইবেলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহার অনেক আগেই কিন্তু বাংলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স নামে একজন ইংরেজ হুগলীতে নূতন বাংলা হরফে ব্যাকরণ ছাপান। বাংলা অক্ষর নির্মাণে তাঁহাকে সাহায্য করেন পঞ্চানন কর্মকার নামে একজন বাঙালী শিল্পী।

কেরী যখন বাংলা বাইবেল মুদ্রণের জন্য ইংলণ্ড হইতে মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা অক্ষর তৈয়ারী করাইয়া আনিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তখন তিনি একদিন কি করিয়া সংবাদ পাইলেন কলিকাতায় পঞ্চানন কর্মকার নামক একজন বাঙালী কারিগর কাঠের বাংলা হরফ তৈয়ারী করিবার কারখানা খুলিয়াছে। ইহা ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের কথা। কেরী তখনই এই শিল্পীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। ভাগ্যক্রমে ইহার কিছু পরেই একজন ধর্মপ্রাণ ইংরেজ ইংলণ্ড হইতে প্রায়-সদ্য-আনীত একটি মুদ্রাযন্ত্র নীলামে কিনিয়া বাইবেল মুদ্রণের জন্য কেরীকে দান করিলেন। কেরী প্রথমে উহা মদনবাটী নামক স্থানে উঠাইলেন। এইবার বাংলা অক্ষরে ব্যবস্থা না করিলে চলে না। ভাগ্যগুণে এই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

মুদ্রাযন্ত্রের একজন অক্ষর-খোদাই করের সাহায্য পাওয়া গেল, এবং একদল নূতন মিশনারীও শ্রীরামপুরে আসিয়া গেলেন। কেরী শীঘ্রই তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন, মুদ্রাযন্ত্রটিও তিনি সঙ্গে আনিয়া শ্রীরামপুরেই স্থাপন করিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি নবলব্ধ মুদ্রাযন্ত্রে বাংলায় অনূদিত বাইবেল ছাপানোর জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। কলিকাতা হইতে কিছু অক্ষর ক্রয় করিয়া আনা হইল। প্রথমে ছাপা হইবে 'ম্যাথুলিখিত সুসমাচার'। কেরী ইহার মধ্যে পঞ্চানন কর্মকারকেও কলিকাতা হইতে আনিয়া নিজেদের মুদ্রাযন্ত্রের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ তারিখে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাংলা বাইবেলের একটি পাতা মুদ্রিত হইল। বাংলার শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহা একটি স্মরণীয় দিন।

সাময়িক পত্র—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের গদ্য রচনা কেবল পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণের উহার সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিল না। কিন্তু বাংলা গদ্য শীঘ্রই এমন একটা কিছুর ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল যাহা সকলের হাতে গিয়াই পৌঁছিতে পারে, ইহা হইতেছে সাময়িক পত্র।

বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্রিকাটির নাম 'দিগ্‌দর্শন'। ইহা মাসিক পত্র। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন হইতে ইহা প্রকাশিত হয়, সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। ইহাতে থাকিত দেশ-বিদেশের বিবরণ ও কৌতুকাবহ গল্প। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়। ঐ বৎসরেরই মে মাসে ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় আর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, উহার নাম 'সমাচার দর্পণ'। ইহাতে চিত্তাকর্ষক নানা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক

বিবরণের সঙ্গে সংবাদও পরিবেশন করা হইত। তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া ইংরেজ মিশনারীগণ এই পত্রিকাখানির উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

ইহার প্রায় সমসাময়িক কালেই কলিকাতা হইতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালী পরিচালিত সাময়িক পত্রিকা ইহাই প্রথম।

মিশনারীদের সমাচার দর্পণ কিছুকাল যাইতে না যাইতেই হিন্দুধর্মের বিপক্ষে এবং খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে নানা প্রবন্ধ বাহির করিতে লাগিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে সমাচার দর্পণ হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়া উহার উত্তর আহ্বান করে। রামমোহন রায় উহার উত্তর লিখিয়া সমাচার দর্পণে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দেন। মিশনারীগণ উহা তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশ না করায় রামমোহন রায় নিজেই একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির কবিলেন, ইহার নাম 'সম্বাদ কৌমুদী'। পত্রিকাখানি ১৮২১ খৃষ্টাব্দেই আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে রচিত প্রশ্নগুলির উত্তরের সঙ্গে থাকিত সরল সহজ ভাষার নীতিগর্ভ অনেক রচনা। সবকিছুই প্রায় রামমোহন লিখিতেন। ভাষা ও ভঙ্গীর নিদর্শন স্বরূপ ১৮২৩ সালের এক সংখ্যা সম্বাদ কৌমুদী হইতে রামমোহনের লেখা 'ক্ষমতাশীল পণ্ডিত' নামক রচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"গ্রীক দেশে একজন পণ্ডিত অবিরোধে কাল যাপন করিতেন। এক সময় তিনি আপন মিত্রদিগের সহিত পথ ভ্রমণ করিতেছেন। ইত্যবকাশে এক ব্যক্তি গোঁয়ার আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তাহাতে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না, ইহা দেখিয়া তাঁহাব মিত্রেরা কহিল, একি

আপনি ইহাকে যে কিছুই কহিলেন না! পণ্ডিত কহিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি গর্দভের নিকট যায় এবং গর্দভ চাইট মারে তবে কি গর্দভের নামে কেহ নালিশ করিয়া থাকে?"

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এই যুগের এক ক্ষমতাশালী লেখক সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশে রামমোহন রায়ের সহযোগী ছিলেন। পরে তিনি এই পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নিজেই একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার নাম ছিল 'সমাচার চন্দ্রিকা'। সমাচার চন্দ্রিকা সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে বিরোধিতা করিত।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করিল। এতদিন সাময়িক পত্রিকাসকল সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু জ্ঞান বিতরণ করিত, কিন্তু সংবাদ প্রভাকর প্রথম হইতেই সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন নিজে কবি ও প্রতিভাশালী লেখক, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে আমন্ত্রণ এবং উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়া সেকালের বহু শক্তিশালী কবি ও সাহিত্যিক এই পত্রিকায় লিখিতে শুরু করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সে যুগের প্রখ্যাতনামা লেখকদের সকলেরই হাতেখড়ি এই সংবাদ প্রভাকরে। ইঁহারা সকলেই গুপ্ত কবিকে নিজেদের সাহিত্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র দেশপ্রীতিমূলক রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং নিজে রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালার বহু কবির জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করিয়া সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করিতেন, ফলে বাংলা সাহিত্যের কিছু সম্পদ বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা পায়।

সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা গদ্য চর্চার আর একযুগ শুরু করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা, আর সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তত্ত্ববোধিনী প্রকাশের পূর্বে বাংলা গদ্য তাহার শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে মাত্র পৌঁছিয়াছে, গদ্যরচনা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি এবং সাবলীল ধারা অবলম্বন করিতে পারে নাই। বাংলা গদ্য তখনও হয় উপমা অনুপ্রাস সমাসে কণ্টকিত, না হয় অপপ্রয়োগে শ্রুতিকটু। তত্ত্ববোধিনী বাংলা গদ্যকে এই অবস্থা হইতে অনেকটা মুক্তিদান করিতে পারিয়াছিল। এই পত্রিকায় অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় গদ্যের যে-ভঙ্গী প্রবর্তন করেন ঐ বিষয়ক রচনায় তাহা আজও অনুসৃত হয়। আর দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে যে-সকল গদ্য রচনা প্রকাশ করেন তাহার প্রাঞ্জলতা গুণ আয়ত্ত করিতে পরবর্তী লেখকদিগের বেশ কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল।

ইহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে যে সকল সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—বিদ্যাকল্পদ্রুম, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, পূর্ণিমা, বামাবোধিনী—ইত্যাদি। বিবিধার্থ সংগ্রহে মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' কাব্য ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' ছিল যেমন সম্পূর্ণ সংস্কৃতপন্থী, প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' ছিল তেমনি সংস্কৃত বিরোধী। এই পত্রিকার ভূমিকায় ছিল—'যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচিত হইবে।' ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইলে বাংলা গদ্যের নূতন ঐশ্বর্যময় যুগ শুরু হইয়া যায়।

রামমোহন—সদ্যোজাত বাংলা গদ্য যখন অনুবাদ এবং অনুকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছিল রামমোহন রায় তখন তাহার বহির্নিগমণের পথ করিয়া

দিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অনেক শিক্ষক ভালো বাংলা লিখিতে পারিলেও তাঁহাদের গদ্য অনুবাদ এবং অনুবাদাশ্রিত পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়া কোন মৌলিক রচনায় তেমন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, কিন্তু রামমোহন তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে দেখাইলেন যে বাংলা গদ্যকে অনেক কঠিন কাজে সার্থকভাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে। অনুবাদ কার্য তিনিও কিছু করিয়াছেন ; কয়েকখানা উপনিষদের প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলাগদ্যে মৌলিক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁহার কম ব্যাপক নহে। তাঁহার গদ্য খৃষ্টান মিশনারী পত্রিকা সমাচার দর্পণের অপপ্রচারের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। তাঁহারই বিরোধিতায় খৃষ্টধর্মের প্রচার এদেশে ব্যাহত হইয়াছে। তাঁহার গদ্য শুধু সংবাদপত্রের প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যুত্তর দানেই নিবদ্ধ থাকে নাই, বেদান্ত প্রচার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি জনহিতকর কার্যেও তিনি উহা ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন। বেদান্ত অনুশীলনে দেশবাসীকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি যে দুইখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন উহাদের নাম— ‘বেদান্তগ্রন্থ’ ও ‘বেদান্তসার’। সহমরণ প্রথা নিবারণের যৌক্তিকতা দেখাইয়া রচনা করেন—‘প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ’। তাঁহার মৌলিক রচনার মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য হইতেছে ‘পথ্য প্রদান,’ ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার,’ এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ : ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, ইংরেজী, উর্দু, বাংলা সকল ভাষায়ই তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল বলিয়া এই ব্যাকরণটিকেও তিনি পরিপূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

রামমোহনের প্রবল আগ্রহ ছিল ধর্মতত্ত্ব প্রচার এবং সমাজ সংস্কার। তাই তাঁহার রচনা ঐ দুটি বিষয় অতিক্রম করিয়া সাহিত্যের অন্য শাখায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। যাহা হউক সবকিছু মিলিয়া তাঁহার

গদ্য রচনার সংখ্যা প্রায় ত্রিশের মত। তাঁহার সকল রচনাতেই যৌক্তিকতা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকায় তাঁহার গদ্যরীতি সর্বত্রই স্বচ্ছ ও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনার আর দুইটি গুণ হইতেছে সংযম এবং গভীর মানবতাবোধ। বিরুদ্ধবাদীর সহিত বাদানুবাদে তিনি কখনও শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার মানবতাবোধের পরিচয় দিবার জন্য সতীদাহ প্রথা নিবারণ কল্পে রচিত 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' নামক গ্রন্থ হইতে কিয়ংদশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

'অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, ...আর ব্রাহ্মণের বা অন্যবর্গের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহাদের বাটিতে স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র—বাংলা গদ্য বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গী এবং কিছুটা প্রাঞ্জলতা লাভ করিয়াছিল রামমোহনের হাতে—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা গদ্যে শিল্পকার্য শুরু করিলেন– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পদ্যের মত গদ্যেরও যে একটি ছন্দ আছে—ইহা প্রথম আবিষ্কার করিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। আমরা আমাদের শ্বাসবায়ু আগম নির্গমের সহিত তাল রাখিয়া কথা বলি, সুতরাং উপযুক্ত বিরামের সুযোগ দিয়া যদি আমরা বাক্য গঠন করি তাহা হইলে দেখা যাইবে গদ্যও ছন্দোবদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার জন্য উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনেরও প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই দুই দিকেই দৃষ্টি ছিল, তাই তাঁহার গদ্যরচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছন্দোবদ্ধ সুললিত কবিতার মত হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার রচিত 'সীতার বনবাস' হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দেখানো যাইতেছে—

"এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি, এই গিরির শিখর দেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।"

শুধু বয়স্কদের জন্য গ্রন্থ রচনায় নয়, শিশুদের জন্য রচিত 'প্রথম ভাগে' পর্যন্ত তাঁহার এই শিল্পজ্ঞানের পরিচয় মিলে। 'কর, খল, ঘট, জল,'—অথবা 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'-তেও এই একই শিল্পের পরিচয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম—'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। সংস্কৃতে ঐ নামে একটি গল্পের বই আছে,—হিন্দীতেও উহা অনূদিত হইয়াছিল। ঐ দুই গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজের ভাষায় স্বীয় গ্রন্থখানি রচনা করিলেন। ইহার পর রচনা করেন তিনি বাংলার ইতিহাস, জীবন চরিত, বোধোদয়, শকুন্তলা, কথামালা, চরিতাবলী, সীতার বনবাস, আখ্যানমঞ্জরী, ভ্রান্তিবিলাস—ইত্যাদি। ঈশ্বরচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা অবশ্য সংস্কৃত, হিন্দী বা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, কিন্তু ইহার একটিও ঠিক অনুবাদ নয়। উপাদান বাহিরের হইলেও দক্ষ শিল্পীর হাতে পড়িয়া আখ্যান এবং ব্যাখ্যান যেন এক নবরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,' 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' এবং 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রভৃতি প্রবন্ধের বই তাঁহার

মৌলিক রচনা। তাহা ছাড়া তাঁহার 'বাল্যকথা' ও 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' অতি উপাদেয় রচনা।

বাংলা গদ্যকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বহু সংস্কৃত শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাগ্‌বিন্যাস রীতি মোটামুটি কথ্য ভাষাকেই অনুসরণ করিয়াছে। তাঁহার 'ভ্রান্তিবিলাস' এবং 'রত্নপরীক্ষা'য় কথ্য ভাষা-ঘেষা এক ধরনের ভাষা চোখে পড়ে।

প্যারীচাঁদ মিত্র—ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষায় অন্যান্য অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও উহা ছিল সংস্কৃতশব্দবহুল সাধু ভাষা। উহা শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত লোকের বোধগম্য, অল্পশিক্ষিতের নয়। সামান্য লেখাপড়া জানা লোক এবং স্কুলে পড়িবার সুযোগ পান নাই অথচ বাড়িতে কিছু লেখা-পড়া করিয়াছেন এমন সব ভদ্রঘরের মেয়েরা উহা পড়িয়া বুঝিতে পারিতেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য 'টেকচাঁদ ঠাকুর'—এই ছদ্মনাম লইয়া প্যারীচাঁদ মিত্র তখনকার কথ্য বা চলিত ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে একখানা উপন্যাস রচনা করিলেন। বাংলা সাহিত্যে ইহাই সর্বপ্রথম উপন্যাস বলা যাইতে পারে। রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে তিনি যে ক্ষুদ্রকায় পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, উপন্যাসটি প্রথমে তাহাতেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বাংলাভাষা হইতে তৎসম শব্দ অবশ্য একেবারে বর্জন করা সম্ভব নয়, তবে সংস্কৃত দুরূহ শব্দ তিনি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করিয়া তৎসম শব্দের সহিত অসংখ্য চলিত শব্দ মিশাইয়া তিনি তাঁহার নূতন ভাষা সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ভাষার নমুনা স্বরূপ 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতে কিছুটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"ছেলে একবার বিগড়ে উঠলে আর সুযুত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সদ্ভাব ক্রমে ক্রমে পেকে উঠতে পারে, তখন কুকর্মে মন না গিয়ে সৎকর্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয়, কিন্তু বাল্যকালে কুসঙ্গ অথবা অসদুপদেশ পাইলে বয়সের চাঞ্চল্য হেতু সকলই উল্টে যাবার সম্ভাবনা।"

জমিদার বাড়ির ছেলে অত্যধিক আদর পাইয়া কেমন বকিয়া যায় উপন্যাসখানিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। চরিত্রগুলি সবই জীবন্ত, বিশেষ করিয়া ঠক চাচার। প্যারীচাঁদের আর একখানি ব্যঙ্গাত্মক গদ্য রচনার নাম 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'।

প্রবন্ধ সাহিত্য

সাহিত্যের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, অর্থ অতি ব্যাপক। সাহিত্য সচ্চিদানন্দ। কাব্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি যাহা যাহা আমাদের আনন্দের রসদ যোগায় সেগুলিকে বলা হয় রসসাহিত্য। আমাদের সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব এবং চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানের খোরাক যোগায় যে-সাহিত্য তাহাকে বলা হয় প্রবন্ধসাহিত্য। প্রবন্ধসাহিত্যে থাকে তথ্য, তত্ত্ব, সত্য বা নীতি। প্রবন্ধে যুক্তির প্রাধান্য বেশি, হৃদয়উচ্ছ্বাসের নয়। বর্ণনাগুণে প্রবন্ধকে সরস এবং হৃদয়গ্রাহী করিবার অধিকার অবশ্য প্রবন্ধকারের আছে,—তবে তত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া নয়। প্রবন্ধ গদ্যেই রচিত হয়।

বাংলা প্রবন্ধ রচনার উন্মেষ হইল সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে। সমাচার দর্পণ হইতে শুরু করিয়া সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, বিবিধার্থ সংগ্রহ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি বাংলা গদ্যে ধর্ম, দর্শন, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক নানা তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করিতে থাকে। ধর্ম ও সামাজিক আচার-বিচার লইয়া বাদানুবাদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বাংলা প্রবন্ধ তাহার বর্তমান শিল্প-রূপটি লাভ করিয়াছে। যে-সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাঁহাদের সাহিত্য সাধনার দ্বারা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে পুষ্ট, পরিবর্ধিত, সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জন সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমারের জন্ম ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের চুপীগ্রামে। পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত, মাতা দয়াময়ী। গ্রামের পাঠশালার শিক্ষার সঙ্গেই তিনি ফারসি ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে কলিকাতায় ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারিতে ইংরেজি শেখেন। হার্ডম্যান জেফ্রয় নামক একজন ইংরেজের নিকট হইতে তিনি কিছু কিছু গ্রীক্, ল্যাটিন, হিব্রু ও জার্মন ভাষা শিক্ষা করেন। ইলিয়ড, ভার্জিল, পদার্থ বিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চাঙ্গ গণিত, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ অপরের সামান্য সাহায্য লইয়া অথবা বিনা সাহায্যেই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তাঁহার সহজাত। এইজন্য তাঁহার রচনায় বুদ্ধিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চেতনার স্পর্শ পাওয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিবার বহু পূর্বেই তিনি

গদ্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। একটি আকস্মিক কারণে প্রথমে সংবাদ প্রভাকরে তাঁহার গদ্য রচনা মুদ্রিত হয়। ঐ পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাহার গভীর হৃদ্যতা ছিল। একদিন সহকারীর অনুপস্থিতিতে গুপ্ত-কবি তাঁহাকে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার অংশবিশেষ অনুবাদ করিতে বলেন। অনুবাদটি গুপ্ত কবির অজস্র প্রসংসা লাভ করে। ইহার পর হইতে উক্ত পত্রিকাটিতে অক্ষয়কুমারকে প্রায়ই লেখা দিতে হইত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানা মাসিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদনা করেন। ইহার পর দীর্ঘ বারো বৎসর কাল তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই সময় দেশের প্রায় সকল গুণী লোকের নিকট সান্নিধ্যে তিনি আসিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রথম বাহির হয়। তাঁহার রচনারীতি সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—'অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।' রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন—

'In Akhay Kumar's style we admire the vehemence and force of the mountain torrent in its wild and rugged beauty.'

অক্ষয়কুমারের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। ইহা দুই ভাগে প্রকাশিত হয়—যথাক্রমে ১৮৫১ ও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে। ইহার পূর্বে স্বল্পউল্লেখযোগ্য আর দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমখানি ভূগোল, দ্বিতীয়খানি 'শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভায় বক্তৃতা' —প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৪১ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ। 'চারু পাঠ' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৫২, ১৮৫৪ ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। এগুলি নানাবিধ প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ। ভাষা গুরুগম্ভীর,

কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারের দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়,—'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' ও 'ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব।' পরবৎসর 'ধর্মনীতি' বাহির হয়। ধর্মনীতির রচনা এইরূপ—

"পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় প্রাণীকেই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্মলাভে অধিকারী করিয়া সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন।"

এই বৎসব অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার 'পদার্থ বিদ্যা' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয়বস্তু নানা ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, অনুবাদিত। রচনার নিদর্শন—

"চক্ষু, কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সমুদয়ই জড় পদার্থ। জড় পদার্থ দুই প্রকাব ; সজীব ও নির্জীব। যাহার জীবন আছে অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি হ্রাস ও মৃত্যু হয় তাহাকে সজীব কহে, যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। আর যাহার জীবন নাই, সুতরাং যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাসাদি হয় না, তাহাকে নির্জীব বলা যায়, যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ ইত্যাদি।"

অক্ষয়কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'—দুই ভাগে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৭০ ও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। H. H. Wilsonএর 'The religious sects of the Hindus' পাঠ করিয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা পান। বস্তুতঃ ইহার বেশির ভাগই তাঁহার নিজস্ব গবেষণার ফল। এই গ্রন্থের ভাষা এইরূপ—

"লাটিন ও গ্রীক, কেলটিক ও টিউটোনিক, লেটিক ও স্লেবোনিক, হিন্দু ও পারসিক ইত্যাদি বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূল জাতি

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্ত্বটি য়ুরোপীয়দিগের শব্দবিদ্যানুশীলনের, বিশেষতঃ সংস্কৃতচর্চার সুধাময় ফল।"

অক্ষয়কুমারের আর একখানি গ্রন্থ 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার'।—রচনা কাল ১৯০১।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায় কলিকাতার এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—১৮২৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ সেকালের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে পড়াইয়া ভূদেবকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। এখানে তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু। মধুসূদনের সহিত ভূদেবের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ভূদেব নিজেই লিখিয়াছেন,—"ক্লাসে আমি ও মধু একসঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সেখানি আমায় না পড়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না।" অথচ এই বন্ধুত্ব তাঁহাকে আত্মমতের সুদৃঢ় ভূমি হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। সে যুগ রেনেসাঁর যুগ, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য চিন্তাজীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই একটা পরিবর্তন সূচিত হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতির ধারা দেশকে একেবারে প্লাবিত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে! অনেক শিক্ষিত বাঙালী নিজেদের সমাজ ও ধর্মের সবকিছু মন্দ ভাবিয়া পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে উন্মুখ। সেই সময়ে ভারতীয় সনাতন জীবনধারার মধ্যেও যে যুক্তি ও শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রবন্ধের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া তিনি বিভ্রান্ত দেশবাসীকে নিজেদের কর্তব্য ভাবিতে শিখাইয়াছিলেন। ভূদেব একদিকে যেমন ভারতীয় মহদাদর্শরক্ষণশীল, অপরদিকে তেমনি পাশ্চাত্যের সদগুণাবলী নিজেদের জীবনে গ্রহণ

করিবার জন্য আগ্রহশীল। তাঁহার চরিত্রে ভাবাবেগ অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য অধিক।

ভূদেবের সাহিত্য চর্চা শুরু হয় ১২৭১ সালে—'শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার' নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া। উহা হুগলী হইতে মুদ্রিত হইত। ইহার অধিকাংশ রচনাই তাঁহার স্বলেখনীপ্রসূত। এই পত্রিকায় যেরূপ রচনা প্রকাশিত হইত তাহার নমুনা ·

"যেমন গ্রীকেরাও কখনও আপনাদিগের জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করে নাই, রোমীয়েরাও করে নাই এবং ইংরাজেরাও যাহা করেন নাই এবং করিতে ইচ্ছুক নহেন আমাদেরও সেইরূপ করিয়া চলা উচিত।"

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ভূদেব 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। উহার প্রথম সংখ্যায়ই তিনি লিখিলেন, "কোন মত, কোন দল, কোন পক্ষ অবলম্বন করার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সকল মতেই, সকল দলেই, সকল পক্ষেই কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা থাকে, কিছুতেই সত্য অথবা মিথ্যা সম্পূর্ণ অমিশ্রভাবে থাকে না।"

বিভিন্ন সময়ে ভূদেবের যে-সকল প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি হইতেছে 'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ও ২য় ভাগ), 'দিনলিপি'।

তাঁহার অনেক রচনাই অনুরাগ-উদ্বেল শিল্প-স্বাদে ভরপুর। পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গ পত্রে পাই—

'মন যেন কি চায়, পায়না—কি যে চায় তা জানেই না। যাহারা শৈশবে আমাকে কোলে পিঠে করিত এবং আপনাদের বলিত, তাহারা ত অনেকেই নাই—যাহারা আছে, তাহারাও থাকিবে না। পৃথিবী শ্মশান ভূমি, এখানে থেকে কাজ কি? মনের এই ভাব, এমত সময়ে একটি

দেবীমূর্তি আমার সম্মুখীন হইল, আমার দুই চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া আমার হাতে হাত দিল, বলিল 'আমি তোমার'। 'আমার' আছে। তবে আমি একজন। আমি থাকিব, আমি করিব, আমি বাড়িব, আমি বাড়াইব। ইতি স্থিতি বিধায়িনী।"

তাঁহার রচনার নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন প্রবন্ধ-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে—

"বাহ্য ব্যাপারে সমস্তকে হেয় জ্ঞান করা আমাদিগের ধর্ম শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিবারই ফল। পৃথিবী কিছু নয়, শরীর কিছু নয়, সংসার কিছু নয়, এ সকলের প্রতি যত্ন এবং আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্যকর্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লেখিত আছে।"—**পারিবারিক প্রবন্ধ**।

"কর্মে নিষ্কামতাই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের আদেশ। যাহা কর্তব্য তাহা কায়মনোবাক্যে করিবে, করার ফলাফল কি হইবে তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখিবে না।"—**সামাজিক প্রবন্ধ**।

"মনুষ্যে পশুধর্ম ও জড়ধর্ম দুইই আছে। পশুধর্ম হইতে স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্তি হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা পশুর ধর্ম।"— **আচার প্রবন্ধ**।

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রবন্ধশিল্পী বঙ্কিম বহুরূপী অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ের দিক দিয়া বৈচিত্র্য আহরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, বিভিন্ন বিষয়ক রচনায় বিভিন্ন প্রকারের স্বাচ্ছন্দ্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা হইতেই ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা, ব্যঙ্গকৌতুক

প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। ক্রমে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদিও তাঁহার রচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। সেকালে লেখার কোন পূর্বাদশ ছিল না, লেখকেরও ছিল অভাব, কিন্তু বঙ্কিম একাই ছিলেন একশ। লেখার আদর্শ ত তিনি গড়িলেনই উপরন্তু গদ্য রচয়িতার সকল ভূমিকাতেই তিনি অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। যে-সকল প্রবন্ধে প্রচুর চিন্তা ও মনের খোরাক মিলে তাহাও বঙ্কিমের প্রতিভা স্পর্শে সাহিত্যরসসম্পৃক্ত হইয়া উঠিল। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্গদর্শন প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধটি হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল, এজন্য। 'Effeminate Hindoos' য়ুরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার য়ুরোপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যে তাঁহারা ভারত জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন আর না-ই করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদের কাছে—মহারাষ্ট্র এবং শিখের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।" এখানে দক্ষ নৈয়ায়িকের ন্যায় যুক্তি দিয়া বঙ্কিম যাহা বলিলেন তাহা আমাদের শুধু বুদ্ধিকে নয় মর্মকে স্পর্শ করে।

বঙ্কিমের প্রবন্ধ রচনার আর এক রীতি ব্যঙ্গ, কৌতুক রঙ্গের আড়ালে তত্ত্ব চিন্তার খোরাক পরিবেশন। বঙ্কিমের প্রথম প্রকাশিত গদ্য গ্রন্থ 'লোক রহস্য' গদ্য রচনার এই বিশিষ্ট ধারার বাহক। লোক রহস্যের

প্রথম রচনা 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাটির প্রারম্ভ এইরূপ—

"একদা সুন্দরবনমধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা বসিয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণপূর্বক সভার কার্য আরম্ভ করিলেন।"

বৃহল্লাঙ্গুল তাঁহার বক্তৃতার এক জায়গায় মুদ্রার পরিচয় দিতে বলিলেন,—"মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ……। মনুষ্য যত দেবতা পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইঁহার প্রতিমা নির্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে। মনুষ্যেরা রাত্রি দিন ইঁহার ধ্যান করে এবং কিসে ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেইজন্য সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়।"

এই রীতিতে প্রথমে রচিত প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ সংকলন 'কমলাকান্তের দপ্তর'। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও নাকি 'কমলাকান্তের দপ্তর'কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আঙ্গিকের দিক দিয়া এই প্রবন্ধগুলিতে Confessions of an English Opium-Eater এবং Pickwicks Papers-এর সাদৃশ্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব কমলাকান্তের চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমব্যক্তিত্ব বিচিত্র, জটিল, অনন্তমুখী। স্বাদেশিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক বঙ্কিমের অখণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এই প্রবন্ধগুলিতে। সুতীব্র শ্লেষ ব্যঙ্গ এই প্রবন্ধগুলিতে কৌতুক রসাশ্রিত

হইয়া কেমন উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে—'ঢেঁকি' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত কবিয়া তাহা দেখানো যাইতেছে—

"আমি সেইখানে চার পাইয়ের উপর পড়িয়া আফিঙ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসাব কেবল ঢেঁকিশালা। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদাবস্বরূপ ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন-ভোজন করিতেছেন। আইন কারক ঢেঁকি, মিনিট বিপোর্টের রাশি -গড়ে পিষিয়া ভানিয়া বাহিব করিতেছেন—আইন ; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত, ভাল মানুষের দেহান্ত।"

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'ও এই ধরনের শ্লেষাত্মক রচনা। হাস্যকর তদন্ত কাহিনীর মধ্য দিয়া ইহাতে সেযুগের সরকাবী খেতাবধারী অযোগ্য ব্যক্তিদের উপর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়াছে।

পূর্বোল্লেখিত প্রথম রীতির প্রবন্ধ রচনার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন 'বিবিধ প্রবন্ধ'। ইহা যেন সে যুগের বাঙালী জীবনভাবনার একটি সাহিত্য গুণান্বিত বিশ্বকোষ। 'বিজ্ঞান রহস্যে'ব রচনাবলীর নামগুলি পর্যন্ত কৌতুকাবহ ও সাহিত্যব্যঞ্জনাধর্মী—'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত', 'আকাশে কত তারা,' 'ধূলা'—ইত্যাদি। বঙ্কিম এই সকল প্রবন্ধে বিজ্ঞানের তথ্যকে উপাখ্যানের মত সরস করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে কৌতূহলকে ধাপে ধাপে তুলিয়া ধবিয়াছেন। 'সাম্য' গ্রন্থে সাম্যনীতি আলোচিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা পাশ্চাত্য সাম্যনীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি ইহা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ-ধারণা হয়তো

ভুল, কারণ বঙ্কিম ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—"সাম্যনীতি নূতন নহে, কিন্তু য়ুরোপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি সেইরূপ লিখিয়াছি।"

'কৃষ্ণ চরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' বঙ্কিমের প্রৌঢ় বয়সের রচনা। এই দুই গ্রন্থে তাঁহার ধর্মচিন্তা, দার্শনিক তত্ত্ব বিচার এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ অপূর্ব দক্ষতা ও সরসতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে। আর ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার অতি প্রিয় অনুশীলনতত্ত্ব। তাঁহার মতে আদর্শ মনুষ্যত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজন মানব-বৃত্তির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২০এ আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দী গ্রামে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ সকলেই সাহিত্যসেবী ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্রজীবন, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ জীবন ও সাহিত্যিক জীবন সবই কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। অতি বাল্য-কাল হইতেই তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে। এ-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"শৈশবেই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আমার যখন আট বৎসর বয়স, আমি যখন গ্রাম্য পাঠশালায়, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। আমাদের বাড়ীতে বঙ্গদর্শন যাইত। লুকাইয়া বঙ্গদর্শন পড়িতাম। সব বুঝিতাম না……অথচ পড়িতাম, লুকাইয়া পড়িতাম।"

ছাত্রজীবনেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধগুলির নাম যথাক্রমে

মহাশক্তি, বিবর্তন, মহাতরঙ্গ, জড়জগতের বিকাশ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বৈদেশিক সভ্যতা। ইহার পর নূতন করিয়া 'সাধনা' বাহির হইলে তিনি সাধনায়ও লিখিতে শুরু করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার প্রসাদগুণ সম্বন্ধে মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—

"অনেকেই বলেন—কথাটাও সত্য যে—দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক—রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত।"

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রকৃতি' বিজ্ঞানবিষয়ক। ইহাতে আছে—সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশ তরঙ্গ, পৃথিবীর বয়স, জ্ঞানের সীমানা, প্রাকৃত সৃষ্টি—ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ইহার পর যথাক্রমে বাহির হয় 'পুণ্ডরীক', 'কুলকীর্তি-পঞ্জিকা', 'জিজ্ঞাসা', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', 'মায়াপুরী', 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', 'কর্মকথা', 'চরিত-কথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'শব্দ-কথা', 'বিচিত্র জগৎ', 'যজ্ঞকথা', 'নানা-কথা' ও 'জগৎ কথা'। তাহা ছাড়া তাঁহার অনেক রচনা এখনও 'সাহিত্য', 'জন্মভূমি' 'মুকুল', 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রদীপ', 'ভারতী'—ইত্যাদিতে আবদ্ধ রহিয়াছে।

চিন্তাসাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি তিনি কেমন সরল সরস সাধারণের বোধগম্য করিয়া তুলিতে পারিতেন তাহার দৃষ্টান্ত দিতে তৎরচিত 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধ হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম অমুকের গাছের নারিকেল বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই

হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে লোকটা মিথ্যাবাদী ; কেহ বলিবে পাগল। কেহ বলিবে লোকটা গাঁজা খায়। এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি বলিবেন, হইতেও পারে ; তবে ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেন না তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে-নারিকেল খাঁটি-নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ-হেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।”

ব্রতকথার ছাঁদে লেখা ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’য় রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। নিম্নে উহা হইতে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

“মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।”

নাটক ও নাট্যশালা

এখন বাংলা দেশে নাটক ও নাট্যশালার অভাব নাই, কিন্তু এখন হইতে দেড়শত বৎসর পূর্বে এ দুয়ের নামগন্ধ পর্যন্ত ছিল না। সংস্কৃত নাটক ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’, ‘রত্নাবলী’ এবং বঙ্গভাষার জননী প্রাকৃতে রচিত নাটক ‘কর্পূর মঞ্জরী’ শিক্ষিত লোকে আনন্দের সঙ্গে পাঠ করিতেন

বটে, কিন্তু বাংলায় কোন নাটক বচিত এবং অভিনীত হইতে দেখা যায় নাই। বাংলাব ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ সবশ্রেণীর লোকেব চিত্তবিনোদনের উপায় ছিল তখনকাব কবিগান, পাঁচালি এবং যাত্রা।

কবিগান—কবিগান যাঁহাবা গাহিতেন তাঁহাদেব বলা হইত কবি-ওয়ালা। ইঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষব বা অল্পশিক্ষিত, কিন্তু সকলেই স্বভাব-কবি। দুই দলেব নাযকেব মধ্যে মৌখিক ছড়া কাটাকাটিব প্রতিযোগিতা হইত, তাহাব সঙ্গে গান এবং ঢোল কাঁসর বাজনা। হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর মধ্যেই কবিওয়ালা দেখা যাইত, এমন কি একজন খৃষ্টান কবিওযালাও ছিলেন, তাঁহার নাম এণ্টুনি ফিরিঙ্গী। সেকালের কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিওযালা হইতেছেন হারু ঠাকুব, রাম বসু ও ভোলা ময়বা। কবিগানেব ভিতব দিয়া যে-বাদানুবাদ হইত তাহাকে বলা হইত 'উতোর চাপান'। কোন একদলেব চাপান অর্থাৎ কোন এক বিষয়ে প্রশ্ন কবা শেষ হইলে অপব দল তাহাব উতোর অর্থাৎ উত্তব দিয়া আবাব অপর চাপান গাহিয়া যাইত। ব্যাপাবটা কিরূপ দাঁড়াইত একটা দৃষ্টান্ত দ্বাবা বুঝাইতেছি। কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেব এক ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ কবিযা অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, পোশাকও এ-দেশীয় লোকেব মত পবিতেন। একবাব কবিগানেব আসরে তাঁহাব বিপক্ষ দলেব নেতা ঠাকুবসিংহ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া চাপান গাহিলেন—

বলহে এণ্টুনি আমি একটা কথা জানতে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই॥

এণ্টুনি তাহাব 'উতোরে' আক্রমণেব প্রতিশোধ লইতে গাহিলেন—

এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাক্‌বে সিংহেব বাপেব জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥

রাম বসুও আসরে ছিলেন, তিনি অমনি গাহিয়া উঠিলেন—

সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।

ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে, গালে দেবে চুন কালি ॥

সাহেব তখনই গাহিলেন—

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নেই রে ভাই।

শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই ॥

আসরে দাঁড়াইয়া তখন তখনই এইরূপ ছড়া কাটিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়াতে আসরে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হইত এবং শ্রোতৃমণ্ডলী উহা বেশ উপভোগ করিত।

পাঁচালি—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সবই পদ্যে রচিত, আসরে উহা গানের মত করিয়া গাহিয়া শোনানো হইত, এবং ইহার নাম ছিল পাঁচালি। কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া এক কথায় পাঁচ কথা আসিয়া যাইত—হয়তো এই কারণেই এই সব আখ্যায়িকাগীতিকে পাঁচালি বলা হইত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে পদচালনার সঙ্গে সঙ্গে এই গান গীত হইত বলিয়া ইহার নাম ছিল পাঁচালি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চৈতন্যভাগবত, বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য সবকিছুই এককালে পাঁচালি আখ্যা পাইয়াছে। পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাঁচালি গান বলিয়া নূতন এক ধরনের এক গান দেখা দিল, ইহাতে থাকিত রামায়ণ, ভাগবত, পুরাণের কাহিনী হইতে লওয়া অথবা সমাজ-রীতিকে বিদ্রূপ করিয়া রচিত নানা পালা। রচনায় পূর্বযুগের ভক্তিভাবের পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ করিল কবির কৃতিত্ব ফলানোর চেষ্টা। এই ধরনের পাঁচালি রচয়িতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন দাশরথি রায়। দাশরথির পাঁচালি গানের নমুনা স্বরূপ তাঁহার রচিত 'নলিনীভ্রমর' পালা হইতে নিম্নে কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

গজমুক্ত গেঁথে দিলাম বনের পশুর গলে।
বোকাকে বললাম হরিবল, সে কেমন করেই বা বলে ॥
জানি বেটা জন্ম-ভেড়া, দিলে কিছু শিক্ষা পড়া, লাগে যদি কাজে।
তাও কখনও লাগে কাজে ॥
দণ্ডড়ের হাতে কি তবলা বাজে।
রামশিঙে যে বাজায় তার হাতে কি বাঁশী সাজে ॥

যাত্রা—আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে ধর্মভাব, উচ্চাদর্শ প্রভৃতি সঞ্চারিত করিবার জন্য যাত্রাগানের প্রচলন দেশে বহুপূর্বকালেও ছিল। ইহাকে বলা হইত নাটগীত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে নাটগীতের বিষয়বস্তু ছিল শিবশক্তিমাহাত্ম্য বা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত কৃষ্ণযাত্রারই বেশি চল হইল। এইসব যাত্রা প্রথম দিকে সঙ্গীতপ্রধান ছিল, পরে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইহার উপরে পাঁচালির প্রভাব পড়িয়া ইহার রূপান্তর ঘটিল। কোন কোন যাত্রায় কৌতুকরসের উগ্রতা দেখা দিল। ক্রমে বাঁধা পালা রচিত হইতে লাগিল। গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখ ব্যক্তিগণ যাত্রার পালা বাঁধিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লোকের রুচির পরিবর্তনের ফলে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা আদৃত হইতে লাগিল। ইংরেজ প্রভাবে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের অনুকরণে যাত্রা শেষে এক নবতম-রূপ ধারণ করিল, ইহার নাম হইল অপেরা বা গীতাভিনয়। ইহা মুক্ত অঙ্গনে দৃশ্যপটহীন নাট্যাভিনয়েরই মত।

নাটক রচনার সূত্রপাত—বাংলার আধুনিক যাত্রাই নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাহার নবতমরূপ লাভ করিয়াছে, যাত্রা হইতে বাংলা

নাটকের উদ্ভব হয় নাই। পাশ্চাত্যের আদর্শে এদেশে রঙ্গ-মঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর হইতে এদেশে নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে হেরাসীম লেবেডেফ নামে একজন নাট্যরসিক রুশ কলিকাতায় আসিয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে বিদেশী ধরনের এক রঙ্গালয় খুলিয়া দুইখানি ইংরেজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করাইয়া বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনয় করান। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে (১৮৩৫) শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু নিজের বাড়িতে ঐ ধরনের স্টেজ বাঁধিয়া বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করান। ইহার তেইশ বৎসর পরে পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহাদের বাগানবাড়িতে স্টেজ বাঁধাইয়া বাংলায় অনূদিত রত্নাবলী নাটকের অভিনয় করান। রত্নাবলীর অভিনয় দেখিয়াই মধুসূদন তাঁহার নাটক রচনার প্রেরণা পান। তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' এইখানেই প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কোন গণমান্য ব্যক্তির বাড়িতে অথবা বাগানবাড়িতে স্টেজ বাঁধিয়া ইংরাজী নাটকের বাংলা তর্জমা অভিনয় করা হইত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে এক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে নাটক রচনায় বাঙালীর বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

অভিনয় নয়—রচনার দিক দিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। রচনা কাল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজি নাটকের আদর্শে মহাভারতের সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত লইয়া ইহা রচিত। ঐ বৎসরেই আর একখানা মৌলিক নাটক প্রকাশিত হয়,—তাহার নাম 'কীর্তিবিলাস'। রচয়িতার নাম যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। বাংলার একটি রূপকথা অবলম্বনে ইহা রচিত। কাহিনীটি বিয়োগান্ত বলিয়া নাটকটিও বিয়োগান্তক।

এদেশে বিয়োগান্তক নাটক এই প্রথম—সংস্কৃত নাটক সবই মিলনান্তক।

এইবার বাংলার কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্বে যে দুইখানি বাংলা মৌলিক নাটকের উল্লেখ করা হইল, উহার কোনটিই অভিনীত হয় নাই, প্রথম যে মৌলিক নাটক অভিনীত হইল, তাহার নাম 'কুলীনকুলসর্বস্ব,' রচয়িতার নাম রামনারায়ণ তর্করত্ন। সামাজিক জীবন ও পারিবারিক সমস্যা লইয়াও ইহার পূর্বে আর কোন নাটক রচিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ সমাজে কুলীনদের অবস্থা তখন কেমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল কুলীনকুলসর্বস্বে তাহারই চিত্র আঁকা হইয়াছে। লেখকের যথেষ্ট সহানুভূতি ও চরিত্র চিত্রণ-ক্ষমতা থাকা সত্বেও কাহিনী অসম্পূর্ণ ও শিথিল, চিত্রগুলি কোথাও কোথাও অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট।

রামনারায়ণ শুধু সামাজিক নাটকই রচনা করেন নাই, তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, তাই সংস্কৃত নাটক অবলম্বন করিয়া তিনি, 'বেণী সংহার' নাটক ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত আর একখানি সামাজিক নাটকের নাম 'নব নাটক'। ইহাতে বহু বিবাহের দোষ দেখানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি—'যেমন কর্ম তেমনি ফল,' 'চক্ষুদান'—এই দুইটি প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন। সে যুগে নাট্য রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামই হইয়াছিল 'নাটুকে রামনারায়ণ'।

মধুসূদন—রামনারায়ণের পরেই নাম করিতে হয় মধুসূদনের। মধুসূদন শুধু বড় কবি ছিলেন না, বাংলা নাট্য রচনায় আধুনিকতার তিনিই পথপ্রদর্শক। ১৮৫৮ সালে রত্নাবলীর অভিনয় দেখিয়া তিনি বাংলায়

ভাল নাটক লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন। বাংলায় সংস্কৃত নাটকের অন্ধ অনুকরণ তাঁহার ভাল লাগে নাই। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকায় একটি উক্তিতে তাহার এই মনোভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে—

'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মাতে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়'।

মধুসূদন পাশ্চাত্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পাশ্চাত্য নাটকে ঘটনা-বিন্যাস ও দৃশ্যসংস্থান কিরূপে করা হয় তাহা তাঁহার ভালই জানা ছিল, তাই তিনি রত্নাবলী দেখিয়া আসিবার পর পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রথমেই 'শর্মিষ্ঠা' নাটকখানি রচনা করিলেন। শর্মিষ্ঠায় নূতনত্বের স্বাদ মিলিল বলিয়া জনসাধারণ ইহাকে তখনকার শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া বরণ করিয়া লইল—কিন্তু বিদগ্ধ জনের বিচারে শর্মিষ্ঠা ত্রুটিশূন্য নয়। যাত্রার মত অতি দীর্ঘ উক্তি এবং অতিরিক্ত কবিত্ব প্রকাশের ফলে ইহাতে নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

মধুসূদন তাঁহার ত্রুটির কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পরবর্তী নাটক 'পদ্মাবতী'তে তিনি তাঁহার ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়াছেন। 'পদ্মাবতী' গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনী অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। শর্মিষ্ঠার কাহিনী লইয়াছিলেন তিনি মহাভারত হইতে।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হইতেছে 'কৃষ্ণকুমারী'। বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক বিষাদান্ত নাটকও এইটি। কাহিনী বিয়োগান্ত হইলেই নাটক বিষাদান্ত হয় না, 'ট্রাজিডি'তে আরও অনেক গুণ থাকা দরকার। পাশ্চাত্য সাহিত্যে গভীরজ্ঞানসম্পন্ন মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে সার্থক ভাবে সেই গুণগুলির বিকাশ করিতে পারিয়াছেন। এই নাটকের

উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তিনি টডের রাজস্থান এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান হইতে।

মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার সর্বোত্তম এবং চরম বিকাশ লক্ষিত হয় তাঁহার দুইখানি প্রহসনে। প্রহসন দুইখানির নাম—'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। প্রথমখানির ভিতর দিয়া তিনি ইংরেজি শিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয়খানির মাধ্যমে তিনি লালসাপরায়ণ 'ভণ্ড' অত্যাচারী প্রাচীন সমাজকে আঘাত হানিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য নাটকের ভাষা অনেকটা কৃত্রিম, কিন্তু ইহাদের ভাষা স্বচ্ছ, সরল, সাবলীল। শেষ জীবনে মধুসূদন 'মায়াকানন' নামে আর একখানা নাটক লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে ইহা প্রকাশিত এবং অভিনীত হয়।

দীনবন্ধু—বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু মোট সাত খানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—এগুলি সেকালের মানুষের যথার্থ পরিচয় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্বক সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতেন, তাহারা কি কবে, কি বলে তাহা ঠিক জানিতেন, কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন – আর কোন বাঙ্গালী তাহা পারেন নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ দেখিয়াছি,—তাহাব ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ।"

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'। 'নীলকর-বিষধরদংশনকাতর' প্রজাদের দুর্দশা মোচন উদ্দেশ্যে নাটকখানি রচিত হয়, এবং ইহা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র নীলচাষ বিরোধী এক প্রবল

আন্দোলন দেখা দেয়। দীনবন্ধু সরকারী ডাক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তাই এই নাটকে তিনি তাঁহার নাম ছাপান নাই। শীঘ্রই নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইল, ইহাতেও কাহারও নাম রহিল না। শোনা যায় অনুবাদ নাকি শ্রীমধুসূদনই করিয়াছিলেন। অনুবাদটি প্রকাশ করিয়াছিলেন পাদরী জেমস্ লঙ। আব কাহাকেও ধরিতে না পারিয়া নীলকরদের আক্রোশ পাদরী লঙের উপরই গিয়া পড়িল। ফলে তাঁহার জেল ও জরিমানা হইল। ইংরেজী অনুবাদেব মাধ্যমে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ ইংলণ্ডে গিয়াও পৌছিল।

নীলদর্পণ নাটকের প্রধান গুণ—ইহার চিত্র ও চরিত্রের বাস্তবতা। তাহা ছাড়া নাটকখানিতে হাস্যরস ও করুণরসের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইহাতে ভদ্র ভূমিকাগুলি ব্যর্থ হইলেও ভদ্রেতর চরিত্রগুলি অতীব জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণি, তোরাপ প্রভৃতি চরিত্রে গ্রাম্যতা, অশ্লীলতা আছে বলিয়াই বাস্তব এবং সম্পূর্ণ। ইহাদিগকে মার্জিত করিতে গেলে চরিত্র অবাস্তব হইয়া উঠিত।

দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে কাহিনী দুইটি। এই দুই কাহিনীকে লেখক ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে পাবে নাই,– তবে প্রথম কাহিনীটি হাস্যরসে উজ্জ্বল। 'লীলাবতী' দীনবন্ধুর পাকা হাতের স্বাক্ষর বহন করে। চরিত্রের দ্বন্দ্ব নাটকখানিকে রসসৃষ্টির দিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের চরিত্র এক অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকখানি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মত নব্য বঙ্গসমাজকে ব্যঙ্গ করিয়া লেখা হইয়াছে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে উপহাস করা হইয়াছে প্রাচীন সমাজকে। হাস্যরসিক দীনবন্ধু 'জামাই বারিক'-এ হাস্যরস সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। 'কমলে কামিনী' দীনবন্ধুর সর্বশেষ নাটক।

গিরিশচন্দ্র—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে যে সাধারণ নাট্যশালা খোলা হয় তাহার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুইজন পরে প্রসিদ্ধ নাট্যকাররূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই দুইজনের একজন হইতেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, আর একজন অমৃতলাল বসু।

সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর অধিক সংখ্যক নাটকের প্রয়োজন অনুভূত হইল। সুদক্ষ অভিনেতা গিরিশচন্দ্র সহজেই জনরুচিও বুঝিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যরচনায়ও লেখনী ধারণ করিলেন। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের ভালটুকু গ্রহণ করিয়া, দর্শকের রুচি, যুগের হাওয়া এবং অভিনেতাদের যোগ্যতা বিচার করিয়া, নূতন ধাঁচে তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, স্বদেশানুরাগ ও ধর্মমূলক নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। ইহার আগে গিরিশচন্দ্র শখের দলের জন্য যাত্রা লিখিয়া হাত পাকাইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি য়ুরোপীয় আদর্শানুগত থিয়েটারে তাঁহার নাট্য স্বভাবকে মুক্তি দিলেন।

গিরিশচন্দ্র অজস্র নাটক রচনা করিয়াছেন। সর্বসুদ্ধ তিনি পঁচাত্তরটি সমাপ্ত এবং চারিটি অসমাপ্ত নাটকের রচয়িতা। বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া ইহাদের চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রহসন। পৌরাণিক ও ভক্তিমূলকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে 'বিল্বমঙ্গল' 'জনা' ও 'পাণ্ডব গৌরব', ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে 'সিরাজদৌলা', 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রধান। সামাজিক নাটকের 'প্রফুল্ল' অনন্যতুল্য, তাহা ছাড়া আছে 'বলিদান' ও 'মায়াবসান'। প্রহসনগুলির মধ্যে 'বেল্লিক বাজার', 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলি তৎকালীন জীবনকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসেন। ইহার পরে রচিত তাঁহার প্রায় প্রত্যেক নাটকেই তিনি পরমহংসদেবের আদর্শে একটি প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার আবেগধর্মী সংলাপ, সাংগীতিক উচ্ছ্বাস এবং ধর্ম-স্বদেশ-প্রেমময় আদর্শবাদ সে-যুগে জনচিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' এখনও তাহার জনপ্রিয়তা হারায় নাই। ইহার মধ্য দিয়া তিনি মদ্যপান ও পারিবারিক বিদ্বেষের বিষময় ফল রূপায়িত করিয়াছেন; 'বলিদানে' প্রদর্শিত হইয়াছে পণপ্রথার পরিণাম।

কোন কোন নাটকের সংলাপ রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভাঙ্গিয়া তিনি এক নূতন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাকে বলা হয় 'গৈরিশ' ছন্দ।

দ্বিজেন্দ্রলাল—অমৃতলালের পরেই বলিতে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের কথা। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার চরম বিকাশ অবশ্য ঐতিহাসিক নাটক রচনায়, তবে নাট্যসাহিত্যে অবতীর্ণ হন তিনি প্রহসন অবলম্বন করিয়া। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম যে প্রহসনখানি রচনা করেন তাহার নাম 'এক ঘরে'। 'এক ঘরে'তে প্রাচীন নবীন উভয়পন্থী হিন্দুসমাজের উপর ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হইয়াছে। ইহার পরের প্রহসন 'কল্কি অবতার'-এ বিলাত ফেরত, ব্রাহ্ম, নব্য হিন্দু, গোঁড়া ও পণ্ডিত সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। 'বিরহে' মিথ্যা ধারণা নিরসন, 'ত্র্যহস্পর্শে' স্থূল কৌতুকরস সৃষ্টির প্রয়াস, 'প্রায়শ্চিত্তে' বিলাত ফেরত, নব্য হিন্দু এবং শিক্ষিতা নারীকে উপহাস এবং 'পুনর্জন্মে' কৃপণ নিষ্ঠুর কুসীদজীবীর পরিণাম প্রদর্শন করা হইয়াছে।

ইহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল 'পাষাণী', 'সীতা', ও 'ভীষ্ম' নামে তিনখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। পূর্ববর্তীদের রচিত পৌরাণিক নাটকের

মত এগুলিতে আধ্যাত্মিকতা বা ভক্তিরসের আধিক্য নাই, এগুলিতে দ্বন্দ্বসংঘাতমূলক মানবীয় ভাবেরই প্রাধান্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা দেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাহারই প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভাকে নূতন পথে চালিত করিল। ইহার পর তিনি হাত দিলেন দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক বচনায়। পর পর বাহির হইতে লাগিল 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'সিংহল বিজয়'। 'তারাবাই' নামে আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক তিনি ইহার পূর্বেই রচনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক রচনা শুরু হয় 'প্রতাপসিংহ' নাটকেব সময় হইতে। বীররস সৃষ্টিতে এবং চরিত্র ও ঘটনার দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে ইনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ছিলেন তাই তাঁহার নাটকের ভাষা কবিত্ব, আবেগ ও উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। এগুলি গুণ হইলেও মাত্রা ছাড়াইলে দোষের হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বত্র মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। তবুও বলিতে বাধা নাই তাঁহার নাটকীয় সংলাপের গতিশীল বলিষ্ঠ কাব্যধর্মী ভাষা একদিন জনচিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ কবিয়া বাখিয়াছিল।

শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল 'পরপারে' এবং 'বঙ্গনারী' নামে দুইখানা সামাজিক নাটক রচনা কবেন। 'পবপাবে' এক সময় বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও নাট্যকৃতির দিক দিয়া অসার্থক, 'বঙ্গনারী' ততোধিক অসার্থক।

উপন্যাস ও ছোট গল্প

বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যে এখন উপন্যাস এবং ছোট গল্পের ছড়াছড়ি। উপন্যাসে পুরোপুরি সম্ভব না হইলেও ছোটগল্পের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর যে-কোন দেশের সম্মুখীন হইবার সাহস রাখে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখন হইতে একশত বৎসর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এ দুইয়ের একটিরও অস্তিত্ব ছিল না। এই দুই-ই লাভ করিয়াছি আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া। গল্প উপন্যাস ধরনের কোন কিছুই যে আমাদের দেশে ছিল না একথা বলিলে ভুল হইবে। আমাদের সংস্কৃত মহাভারতে গল্প এবং উপন্যাস উভয় শ্রেণীরই বহু আখ্যায়িকা আছে। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র ত কেবল গল্পেরই সমষ্টি। ইহা ছাড়া ছিল পালি ভাষায় রচিত বুদ্ধের নানা জন্মের কাহিনী,—জাতকের গল্প। কিন্তু এ-সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল গল্পচ্ছলে নীতিপ্রচার। কথাসরিৎসাগরে, বেতালপঞ্চবিংশতিতে যে-সকল গল্প পাওয়া যায় তাহার সব চরিত্র মানুষ নয়। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের মধ্যেও কাহিনী ছিল, কিন্তু তাহাতে ছিল কোন না কোন দেবচরিত্রের প্রাধান্য সুতরাং উহাকেও উপন্যাসধর্মী বলা যায় না। আর তাহা ছাড়া এগুলি রচিত হইয়াছিল পদ্যে। মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্যধারার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে আর একটি সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হইতেছিল তাহা হইতেছে লোকসাহিত্য। ইহার মধ্যেও আধুনিক গল্প উপন্যাসের অনেক উপাদান মিলে। লোকসাহিত্যের একটি প্রধান শাখা হইতেছে রূপকথা। প্রেম-সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি মানব জীবনের কতকগুলি

প্রবলতম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই রূপকথার উদ্ভব। আধুনিক কথা-সাহিত্যে প্রেমের যে-শক্তির পরিচয় মিলে রূপকথাও তাহা হইতে বঞ্চিত নয়। পার্থক্য শুধু এই যে রূপকথার প্রেম রূপলোক অর্থাৎ স্বপ্ন জগতের মধ্য দিয়া প্রকাশিত, আর গল্প-উপন্যাসের প্রেম রূপায়িত হয় বাস্তব জগতের মধ্য দিয়া। লক্ষ্য একই। আধুনিক উপন্যাসের ধর্ম আরও একটু স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছিল মৈমনসিংহ গীতিকার মধ্যে। মানব জীবনের সুখ দুঃখ আশা নৈরাশ্য প্রেম দ্বন্দ্ব লইয়াই ইহার কাহিনী গ্রথিত। আধুনিক উপন্যাসের সহিত ইহার পার্থক্য শুধু এই যে, ইহা পদ্যে রচিত আর উপন্যাস গদ্যে রচিত। আর ইহা মুখে মুখে গীত হইবার জন্য রচিত বলিয়া সংক্ষিপ্ত। উপন্যাসের মত অত্যধিক চরিত্রের ভিড় এবং জটিলতা ইহাতে নাই।

এতক্ষণ যাহা আলোচিত হইল তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে আধুনিক গল্প-উপন্যাসের সম্ভাবনা সবই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের মধ্যেই বর্তমান ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর পুনর্জাগরণের দিনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে নূতন দিক আবিষ্কার করিয়া উহা শুধু নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকারদের কথা আলোচনা করিবার পূর্বে উপন্যাস ও ছোটগল্পের লক্ষণ প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকের ধারণা গল্প আকারে ছোট হইলেই উহা ছোট গল্প এবং আকারে বড় হইলেই উহা উপন্যাস নামে অভিহিত হয়। কথাটা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। ছোট গল্প ও উপন্যাসের মাঝে মূল পার্থক্য আকারে নয়—প্রকারে অর্থাৎ প্রকৃতি-গত।

ছোট গল্পে জীবনের এমনি একটা খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হয় যে,

উহা উহার স্বল্প পরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে। ছোট গল্পের আরম্ভ এবং উপসংহার উভয়ের মধ্যে নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা প্রয়োজন। পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের ইহাতে স্থান নাই। গল্পের পরিণতি বা চরিত্র বিকাশের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক ঘটনা ইহার জন্য প্রয়োজন মাত্র সেইগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ইহাতে একেবারে নিষিদ্ধ। ছোট গল্প আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া দেয়, উহাকে নিবৃত্ত করে না। কখনও কখনও উহা আমাদের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া দেয়, যাহা এত দিন দেখিয়াও দেখি নাই তাহা দেখাইয়া দেয়। তখন বুঝি যাহা এতদিন সামান্য মনে করিয়া তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছি তাহাও তুচ্ছ নয়। ছোট গল্প কোথা হইতে যেন এক ঝলক আলোক আনিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কিয়দংশ আমাদের ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়ে সহায়তা করিবে—

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে 'ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘন ঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ॥

ছোট গল্প যেন একটি 'লিরিক'—A lyric in Prose. ছোট গল্পকে কেহ কেহ অবগুণ্ঠনবতী নারীমুখের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া যতটুকু সৌন্দর্য প্রকাশ পাইতেছে তাহা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দেখিবার উপায় নাই।

আর এদিকে উপন্যাসে থাকে স্থান ও কালের বিস্তৃত পটভূমিকায় নানা জীবনের বিচিত্র বিপুল ব্যাপক পরিচয়। ইহাতে একটা সমগ্র যুগের, সমগ্র সমাজের, এমনকি সমগ্র দেশের চিত্র অঙ্কন করা যাইতে পারে,—সে চিত্রে থাকিতে পারে বহু চরিত্রের ভীড়। বহু আশা-নিরাশা সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগের ঘাত-প্রতিঘাত। মূল কাহিনীর কাণ্ড হইতে বহু শাখা-কাহিনী বাহির হইয়া ঘটনার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারে। উপন্যাসে বেশ ভূমিকা করিয়া কাহিনী আরম্ভ করা যায়, প্রয়োজন হইলে কোন তত্ত্ব লইয়া বক্তৃতা করা চলে। শুধু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সবকিছুই যেন মূল কাহিনীকে সার্থকতার দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়।

এখন বাংলা দেশে বহু সুদক্ষ গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্বে কথা-শিল্পের প্রস্তুতির যুগটা দেখিয়া কেহ হয়তো ধারণাই করিতে পারে নাই, কথা-শিল্পে বাংলা সাহিত্য একদিন এতটা সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। দুর্গেশনন্দিনীর সাত বৎসর পূর্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'কে বাংলায় প্রথম উপন্যাস বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু সার্থক উপন্যাস আখ্যা পাইতে যে যে গুণের প্রয়োজন হয় তাহার অনেক কিছুরই ইহাতে অভাব রহিয়াছে। ঠক চাচা, বাবুরাম, মতিলাল প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র ইহাতে সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্তর্জগতের কোন গভীর সংঘাত ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া মূল কাহিনীর সঙ্গে ইহাদের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। বস্তুতঃ ইহাকে উপন্যাস বলিতে হইলে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রচিত

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস'কেও উপন্যাস বলিতে হয়। এ দুইটি হইতে বরং ১৮৫৬ ৫৭ খৃষ্টাব্দে রচিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এ উপন্যাস অধিকতর মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এ দুইটি কাহিনী আছে—'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় অঙ্গুরী বিনিময়ের কিছুটা প্রভাব পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র—বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিতে হয়। এই বৎসর সার্থক উচ্চাঙ্গ উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' আত্মপ্রকাশ করিল। রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলার ইংরেজীশিক্ষিত সমাজ তখন পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমে উপন্যাসের রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, সেই রস স্বদেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রবাহিতও করা যায় দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। আবার যাহারা ইংরেজী জানিতেন না, তাঁহারা বাংলা সাহিত্যে এমন একটি অপূর্ব জিনিস পাইয়া ততোধিক বিস্মিত হইলেন। বাংলা গদ্য তখনও কোন সুপরিণত রূপ লাভ করিতে পারে নাই। সকলের বোধগম্য ভাষায় লিখিতে গেলে লিখিতে হয় আলালী ভাষায়, আবার সাধু ভাষায় লিখিতে গেলে সমাস-বহুল পণ্ডিতী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বঙ্কিমের মনে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছে, অথচ প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। বঙ্কিম তখন তাঁহার সমপর্যায়ের অপর দশজনের মত ইংরেজীতেই তাঁহার কথাশিল্প শুরু করিলেন। ইংরেজীতে লেখা Rajmohan's wife-ই তাঁহার সর্বপ্রথম উপন্যাস। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, এবং স্বীয় প্রতিভাবলে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া কথ্য ও সাধুভাষার মিশ্রণে এক বলিষ্ঠ শ্রুতিমধুর ভাষা সৃষ্টি করিয়া বঙ্গবাসীকে

এক নূতন রস পরিবেশন করিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ।

তাঁহার সৃজনীশক্তির বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসখানির ভিতর দিয়াই ধরা পড়িল। দুর্গেশনন্দিনীর বিষয়বস্তু—মোগল-পাঠান বিরোধের পটভূমিকায় একটি চিরন্তন মানবিক প্রেম কাহিনী, কিন্তু কল্পনার বিস্তারে, চরিত্র অঙ্কনে এবং জীবনবোধের সুগভীর উপলব্ধিতে বাংলা সাহিত্যে ইহা অভূতপূর্ব। প্রেমের আকর্ষণ যে জাতিধর্মনিরপেক্ষ দুর্নিবার, তাহা দেখাইতে তিনি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের ভাগ্যের সহিত বাঙালী রাজদুহিতা তিলোত্তমা এবং পাঠান সুলতান কতলু খাঁর কন্যা আয়েষার ভাগ্য সংযোজিত করিয়াছেন। বীরেন্দ্রসিংহের তেজস্বিতা, অপরিচিত, রাজপুত যুবকের প্রতি বীরেন্দ্রদুহিতা তিলোত্তমার সলজ্জ প্রেমানুভূতি, শুশ্রূষাকারিণী আয়েষার নীরব গভীর প্রেম, ওসমানের ব্যর্থ প্রেমের গভীর বেদনা, বিমলার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—এই সবের ভিতর দিয়া মানব চরিত্রের যে ঔদার্য, মাধুর্য ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনকে মানুষের প্রতি মমতায় উদ্বেলিত করিয়া তোলে। যুদ্ধের অসি ঝনৎকারের মধ্যে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের চরিত্র বেশ কিছুটা হাস্যরসেরও উদ্রেক করে। দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা চরিত্র সম্পর্কেই অনেকে বলেন—এইখানে স্কটের আইভ্যানহোর প্রভাব আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বার বার বলিয়াছেন আইভ্যান্‌হো পড়িবার পূর্বে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের অল্প বয়সের প্রথম রচনা বলিয়া সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলা আরো সুপরিকল্পিত। চরিত্রগুলি আরোও উজ্জ্বল ও স্পষ্ট।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরের নেগুয়া (বর্তমান কাঁথি) অঞ্চলে চাকরী উপলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সমুদ্রতীরের

বালিয়াড়ির পাশেই তাঁহার অবস্থান ছিল। সেখানে কিছুদিন যাবৎ এক কাপালিক অধিক রাত্রিতে প্রায়ই তাঁহার কাছে আসিতেন। অনেকেরই ধারণা সেই কাপালিকই বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে শিল্পমূর্তি লাভ করিয়াছে।

লোকালয় হইতে দূরে সমুদ্রতীরের নির্জন পরিবেশে কাপালিকের কাছে কোন কন্যা যদি প্রতিপালিতা হইতে থাকে, যৌবনে তাহার প্রকৃতি কি হইবে—তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি তাঁহার এই উপন্যাসে। প্রকৃতিক্রোড়ে পালিতা কপালকুণ্ডলাকে ঘটনাচক্রে নবকুমার বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন, তাহাকে ভালবাসিলেনও গভীরভাবে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা দাম্পত্য জীবনে বাঁধা পড়িল না। মুক্ত জীবনের প্রতি তাহার আকর্ষণ পূর্বের মতই রহিয়া গেল। ননদিনী শ্যামাসুন্দরী যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার সুখ কিসে, সে উত্তর করিল, বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে। স্বামী নবকুমারের প্রতি অপর কোন নারীর অনুরাগ দেখিলে তাহার প্রেম উদ্রিক্ত হইতে পারে, তাই আগ্রার প্রাসাদজীবন হইতে নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী বিলাসিনী পদ্মাবতীকে আনিয়া বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা নিস্পৃহভাবে পদ্মাবতীর অনুরাগ মানিয়া লইয়াছে, শুধু তাহাই নয় সে নিজের মুক্তি কামনায় তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল কাজ এত সহজে নিষ্পন্ন হইয়াছে যে ইহাতে আমাদের বাস্তববোধকে বিন্দুমাত্র পীড়িত করেন না।

বঙ্কিমের তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী'। ইহাতে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। স্বদেশকে ভালবাসার প্রথম প্রেরণাও বঙ্কিম ইহাতেই দিয়াছেন। রাজ্যহারা মগধের রাজপুত্র

হেমচন্দ্র মৃণালিণীকে ভালবাসিয়াছিলেন, কিন্তু গুরু মাধবাচার্যের নির্দেশ ছিল মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস না করিয়া হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে গ্রহণ কবিতে পাবিবেন না। নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের পরে হেমচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃণালিনীকে বিবাহ করিলেন। এই উপন্যাসটিতে পশুপতি, মনোরমা ছাড়া আর কোন চরিত্রই তেমন পরিস্ফুট হয় নাই।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। উহার প্রথম সংখ্যা হইতেই বঙ্কিমের চতুর্থ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' বাহির হইতে শুরু করে। ইতিহাসের ক্ষেত্র ছাড়িয়া সমকালীন মানুষের জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত ইহাই তাঁহার প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের মধ্যে নীতিব পুর দিবার চেষ্টাও ইহাই তাহার প্রথম। নীতি হিসাবে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের বলিবাব মত কিছু নাই,—কিন্তু আদর্শ সাধ্বী স্ত্রী ঘরে থাকিতে শুধু রূপের মোহে দ্বিতীয়বার যে কোন মেয়েকে বিবাহ করিলে যে সংসারে বিষবৃক্ষ রোপণেরই সমান—বঙ্কিম তাঁহার এই উপন্যাসে হয়তো এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। তরুণ তরুণীর মনে অনুকম্পার ছদ্মবেশে কখন যে অনুরাগ আসিয়া সামাজিক পারিবারিক আইন তুচ্ছ করিয়া নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসে, ইহাও এই গ্রন্থে দেখানো হইয়াছে।

বিষবৃক্ষের প্রধান চরিত্র নগেন্দ্রের স্ত্রী সূর্যমুখী। স্বামীর সুখের জন্য তিনি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া সাধ্বী পত্নীর এক মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারও মনের মধ্যে কীটের মত যে সামান্য অভিমান ও অহঙ্কার নিজের অলক্ষ্যে বাস করিত উহা তাঁহার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। সরলা নিষ্পাপ কুন্দের চরিত্রও যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত আঁকা হইয়াছে। কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের

প্রেম মোহজ আখ্যা পাইলেও নগেন্দ্রনাথের প্রতি কুন্দের প্রেম গভীর, অকৃত্রিম। সে বিধবা বলিয়া সে প্রেমও তাহার সার্থক হইতে পারিল না, এইখানেই 'ট্রাজেডি'। সে বিধবা না হইলেও অবশ্য এইরূপ বিষাদান্তই কিছু ঘটিত, সংসারে সতী সাধ্বী অনুরাগিনী স্ত্রী বর্তমান থাকিতে দ্বিতীয়া ঘরে আসিলেই এইরূপ ঘটিবার কথা। একাধিক বিবাহেরই এ বিষময় ফল। নিরপরাধ কুন্দ নগেন্দ্রের অকারণ উপেক্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুর কোলে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইল। ইহাদের জীবনের মধ্যে দেবেন্দ্র ও হীরার উপকাহিনী যুক্ত হওয়ায় কাহিনী আরও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে।

'বিষবৃক্ষে'র আর একটি সার্থক চরিত্র নগেন্দ্রের ভাগিনী কমল। স্বামী সৌভাগ্যবতী সন্তানজননী কমলকে বঙ্কিম 'সোনার কমল' করিয়া আঁকিয়াছেন। পাপীয়সী হীরার চরিত্র অঙ্কনেও বঙ্কিম কম কৃতিত্ব দেখান নাই।

ইহার পরের উপন্যাস 'রজনী' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে থাকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থ রচনায় বঙ্কিম এক নূতন রীতি অবলম্বন করেন: পাত্র-পাত্রীর আত্মকথার ভিতর দিয়া বর্ণিতব্য প্রকাশিত হয়। রজনী জন্মান্ধ ফুলওয়ালী। নানা দৈব দুর্বিপাক ও বিলম্বিত জটিলতার অবসানে তাহার জীবন সফল হয়। বঙ্কিম ইহার বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন "লর্ড লিটন রচিত "Last days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে 'নিদিয়া' নামে একটি 'কাণা ফুলওয়ালী' আছে; 'রজনী' তৎস্মরণে সূচিত হয়।" কাহিনী বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার মুখে বর্ণিত হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "উইলকি কলিনস্ কৃত Woman in White নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ-প্রথার গুণ এই যে, যে-কথা যাহার মুখে শুনিতে

ভাল লাগে, সেই কথাই তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এ উপন্যাসে যে-সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।" 'রজনী'তে সন্ন্যাসীর আলৌকিক প্রভাবের কথা আছে, বকলমায় বক্তব্য উপস্থাপিত করাতেই তাহার অবাস্তবতা দোষ ক্ষালিত হয় নাই। কিন্তু ইহাতেও মূল উপন্যাসের রস ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কারণ 'রজনী'র সবটুকুই রজনী-শচীন্দ্রের কথা লইয়া নয়, বরং অমরনাথ-লবঙ্গ প্রসঙ্গই ইহাতে উপন্যাসের জটিলাবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। এই দিক দিয়া 'রজনী' সার্থক উপন্যাস। আবার অমরনাথের একদিনের ক্ষণিক ভুল তাহার সারা জীবনের অসহ্য তাপদাহের কারণ হইয়া তাহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়াছে, তাহার ভাঙা নৌকা যোড়া লাগে নাই, এই দিক দিয়া 'রজনী' ট্র্যাজেডি। আবার অন্ধ নারীর শব্দ স্পর্শগন্ধময় প্রণয়চেতনা ও তাহার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের দিক দিয়া 'রজনী' রোমান্স।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহার সহিত বিষবৃক্ষের কাহিনীর বেশ কিছুটা সাদৃশ্য আছে। বিষবৃক্ষে সুখী দম্পতি নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে যেমন কুন্দ,—'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর-গোবিন্দলালের জীবনে ধূম-কেতুর মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তেমনি 'রোহিণী।' পার্থক্যও আছে—'বিষবৃক্ষে'র কুন্দের চরিত্র কুন্দফুলের মতই শুভ্র, অনাবিল, নিষ্পাপ; আর রোহিণী অতৃপ্ত বাসনার অগ্নিশিখা। কাহিনীর শেষাংশে দুইটি নারীরই লেখক মৃত্যু ঘটাইয়াছেন। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মিলন সম্ভব হইয়াছে কারণ কুন্দফুল অভিমানে আপনিই ঝরিয়াছে,—কিন্তু গোবিন্দলাল-ভ্রমরের মিলন সম্ভব হয় নাই, অভিমানিনী ভ্রমর অধর্মচারী নারীহন্তা স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই; অনুতাপদগ্ধ নিরাশ্রয় গোবিন্দলাল শেষে

ভগবৎ পাদপদ্মে মন স্থাপন করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছেন। কাহিনীর উপসংহারে তিনি ভাগিনেয় শচীকান্তকে বলিয়াছেন,—'যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি।······ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃ স্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।'

'কৃষ্ণকান্তের উইলের' বিশেষত্ব এই যে, সমস্ত ঘটনাটাই এমন স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়াছে যে, কাহিনীর বিষাদান্ত পরিণতির জন্য যেন কাহাকেও দায়ী কবা যায় না। গভীর স্বামীপ্রেমের জন্যই ভ্রমরের মনে আত্মঘাতী নিদারুণ অভিমান জাগিয়াছে, গোবিন্দলাল মৃতকল্পা রোহিণীর সেবা করিতে গিয়াই তাহার দেহ স্পর্শ করিয়াছেন, এবং ভ্রমর দুঃখ পাইবে ভাবিয়াই সে-কথা তাহার কাছে লুকাইয়াছেন। বালবিধবা সুন্দরী রোহিণীর মনে স্বাভাবিক নিয়মে প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগাও এমন কিছু অন্যায় নয়। প্রসাদপুরের কুঠীতে তাহার বহিরভিসারই শুধু নিন্দনীয়। মোট কথা বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে তাঁহার কথাশিল্পের একেবারে চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। অন্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের জীবন কেমন করিয়া নিজেদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়—কৃষ্ণকান্তের উইল তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"

এই উপন্যাস রচনায় তথ্যের সহিত কল্পনা কতটা মিশ্রিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধেও বঙ্কিমের স্পষ্ট উক্তি ব্যক্ত হইয়াছে—"স্থূল-ঘটনা—অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে প্রায় তেমনি রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নয়···ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেবউন্নিসা উদিপুরী—ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্র ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে-সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।'

উপন্যাসের কাহিনী এইরূপ—রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর চিত্রক্রয়ের ব্যাপার হইতেই অনর্থের সূত্রপাত। উদিপুরী বেগমের পরামর্শে আওরঙ্গজেব চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য দিল্লীতে পাঠাইতে আদেশ দিলেন। চঞ্চলকুমারীর পিতা রূপনগরের সামন্ত রাজা বিক্রম শোলাঙ্কী কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে উদয়পুরের রাজা রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হইয়া আওরঙ্গজেব রাজসিংহকে সায়েস্তা করিতে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিলেন উদিপুরী বেগম ও কন্যা জেবউন্নিসা। রাজসিংহ কৌশলে আওরঙ্গজেবকে গিরিবর্ত্মের মধ্যে ফেলিয়া সন্ধি করাইতে বাধ্য করিলেন। কিছুদিন পর আওরঙ্গজেব সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিয়া দিলীর খাঁকে দিয়া উদয়পুর আক্রমণ করাইলেন। এবারেও মোগল সৈন্যের পরাজয় হইল। ইহার পর রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করিলেন।

রাজসিংহ সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনায় লিখিয়াছেন—' ইতিহাস ও উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়-বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু

খর্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারো অগ্রবর্তী না হয় এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখ দুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত।”

‘আনন্দমঠ’ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীর জাতীয়তা-বোধের আদি মন্ত্র ‘বন্দেমাতরম্’ এই উপন্যাসেই প্রথম উচ্চারিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে শুধু কাহিনীই শুনান নাই, ইহার ভিতর দিয়া তিনি জীবনের একটি পবিত্র ব্রত উদযাপন করিয়াছেন। বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় যে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ দেখা দেয় তাহাকেই সন্তান-বিদ্রোহ কল্পনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠের কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। সন্তানদলের নেতা সত্যানন্দ দেশের জন্য সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ। গভীর নিষ্কাম কর্মযোগই তাঁহার সাধনার পথ, তাই তিনি ক্ষাত্র বৈষ্ণব। আনন্দমঠ দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিলেও ইহা প্রচারমূলক সাহিত্য হইয়া উঠে নাই,—কারণ ইহার কাহিনীর অন্তস্তলে একটা মানবিক অনুভূতির ধারা সাবলীল গতিতে বহিয়া গিয়াছে। শান্তির প্রেম, ভবানন্দের পদস্খলন ইত্যাদি বাস্তবধর্মী উপন্যাসেরই উপাদান।

ইহার পর ‘দেবী চৌধুরাণী’ (১৮৮৩)। দেবী চৌধুরাণী ঐতিহাসিক চরিত্র হইলেও তাহার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দেবী চৌধুরাণীর’ কোন সম্পর্ক নাই। বঙ্কিমের উপন্যাসে বর্ণিত ভবানী পাঠক, গুড্‌ল্যাড, লেফটেন্যান্ট ব্রেনান্ প্রভৃতি নামগুলিও ঐতিহাসিক। বঙ্কিম দেবী চৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন—“এই উপন্যাসে যে পরিবেশে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক।” মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে অথচ বৃটিশ শাসন

সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই এই সময়ে দেশে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই অশান্তির পটভূমিতেই বঙ্কিমচন্দ্র ভবানী পাঠকের সহায়তায় দেবীর আবির্ভাব ঘটাইলেন। বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল—দেবীর মাধ্যমে নিজের প্রিয় অনুশীলন তত্ত্ব প্রচার। গুরু ভবানী পাঠকের নির্দেশে গৃহস্থবধূ প্রফুল্লকে তাই শাস্ত্র পাঠ, সঙ্গীতচর্চা হইতে শুরু করিয়া লাঠিখেলা কুস্তি পর্যন্ত করিতে হইয়াছে। ভবানী পাঠক তাহাকে ত্যাগধর্মে দীক্ষিত করিয়া দেবীতে পরিণত করিয়া রানীর সিংহাসনে বসাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাহার প্রাণের ক্ষুধা মিটিল না, দেবী তাই সিংহাসন ছাড়িয়া প্রফুল্ল সাজিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিলেন।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৮৫) উপন্যাসে শৈবলিনীর চরিত্র অঙ্কন বঙ্কিমচন্দ্রের একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। চরিত্রের উন্মেষ হইতে পরিণতি পর্যন্ত শৈবলিনীর জীবন যেন সমাজকে নারীজীবন ব্যর্থতার জন্য নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করিয়াছে। রোমান্স রচনার সুযোগের জন্য বঙ্কিমকে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিই বাছিয়া লইতে হইয়াছে। বাঙালীর মহত্ত্ব ও বীরত্ব প্রদর্শনের বাসনা তাঁহার মনে চিরকালই প্রবল, অথচ পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনের মধ্যে তাহার স্ফূর্তি তিনি তেমন দেখিতে পান নাই,—তাই এদিক দিয়াও ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। মীরকাসিম-ইংরেজের সংঘর্ষ অবলম্বনে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির যে সুযোগ পাইলেন—নিতান্ত সামাজিক পটভূমিকায় তাহা তিনি পাইতেন না। আধ্যাত্মিক যোগবলের প্রতি তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল 'চন্দ্রশেখরে' আমরা তাহারও পরিচয় পাই। তাঁহার সৃষ্ট উপন্যাস-জগতে সর্বপ্রথম একটি আদর্শ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, এ চরিত্র প্রতাপের।

'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী'—এ তিনটি ঠিক উপন্যাস

পর্যায়ে পড়ে না। ইহারা গল্প। ছোট গল্পের লক্ষণও অবশ্য ইহাতে পুরোপুরি মিলে না, ইহারা শুধু গল্প— বড় গল্প।

'ইন্দিরা'তে বঙ্কিম আবার 'রজনী' রচনার রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ ইন্দিরা নিজের কাহিনী নিজেই বলিয়া যাইতেছে। সে প্রথম স্বামীগৃহে যাইতেছিল,—পথে কালো দীঘিতে তাহাকে ডাকাতের হাতে পড়িতে হইয়াছিল। পরে নানা কৌশলে সে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইল। স্বামীকে হস্তগত করিবার জন্য তাহাকে নানা নারীকলার প্রয়োগ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমের শালীন রুচিবোধ ইহাকে মাত্রা অতিক্রম করিতে দেয় নাই। এক কথায়—ইন্দিরা একটি লঘু-চালের সরস গল্প।

'যুগলাঙ্গুরীয় এক প্রেমের কাহিনী। বণিককন্যা হিরন্ময়ীর সহিত পুরন্দরের মিলন ইচ্ছায় দৈব বাদ সাধিল। একদিন অনুকূল বাতাসে মনের কালো মেঘ কাটিয়া গেলে তাহারা আবার মিলিত হইল।

'রাধারাণী'র কাহিনীতে পাই রাধারাণী নামে এক দুঃস্থ বালিকা মাহেশের রথের মেলায় তাহার রুগ্না মায়ের পথ্য ব্যবস্থার জন্য নিজের হাতে ফুলের মালা বিক্রী করিতে আসে। রুক্মিণীকুমার ছদ্ম নাম লইয়া এক ধনী সহৃদয় যুবকের অনুরাগ-ঋদ্ধ দানে সে যাত্রা তাহার দুর্গতি মোচন হয়। রাধারাণী পরে তাহার পিতার বৃহৎ সম্পত্তি ফিরিয়া পায়, —সর্বশেষে রুক্মিণীকুমারের পরিচয় পাইয়া তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। রাধারাণীর গল্প মাত্র এইটুকু।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' (১৮৮৬)। বাঙ্গালীর বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করিতে বঙ্কিমের উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাই বাংলার ইতিহাস হইতে একটি বীরচরিত্রই তিনি তাঁহার এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছেন। বঙ্কিম নিজে সীতারামকে ঐতিহাসিক

উপন্যাস বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই, কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনা-গুলির ও সেই যুগের বাংলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার অধিকাংশ একেবারে সত্য।"

বঙ্কিম বাঙালীর বীরত্বে বিশ্বাস করিতেন। তিনি তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' লিখিয়াছেন –"বাঙালী যে চিরকাল ভীরু কাপুরুষ ছিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই বরং তাহারা যে বহুবলশালী ছিল, সাহসী ছিল তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়, বাঙালী লাঠিয়ালের কথা ইতিহাসে লেখা আছে।" বাঙ্গালীর বীরত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি সীতারামের দ্বারা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন, কিন্তু স্বপ্ন ত সফল হইবার নয়, তাই সীতারামের বীরত্বে ধ্বংসের বীজ আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। সে বীজ সীতারামের হৃদয়েরই কামনা। প্রিয় প্রাণহন্ত্রী হইবে বলিয়া বিবাহের পরেই তাঁহার প্রথমা স্ত্রী তাঁহার সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, ঘটনাচক্রে বহুদিন পরে তাহার দেখা পাইতেই তাহার প্রতি সীতারামের মোহ জন্মিল। এই মোহের সাহায্যেই বঙ্কিম সীতারামের বীরত্ব অটুট রাখিয়াও তাঁহার পতন সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় অনুশীলন তত্ত্ব 'সীতারাম' উপন্যাসের মধ্যে কিছুটা প্রচারিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত – বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে বাংলা উপন্যাস লিখিয়া আব যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহরমপুরে সরকারী কর্মসূত্রে বঙ্কিমের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে ইনি ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চা করিতেন। বঙ্কিমের আহ্বানেই তিনি বাংলা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হন। রমেশচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন—"একদিন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা

হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'যদি বাংলা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাংলা লেখ না কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম,—'আমি যে বাংলা কিছুই জানি না। ইংরেজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাংলা শিখি নাই। কখনো বাংলা রচনা পদ্ধতি জানি না।' গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, 'রচনা পদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক। তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।' এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল!'

রমেশচন্দ্রের ইতিহাসেই বেশি অধিকার ছিল—তাই ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক রচনায়ই তিনি প্রথম হস্তক্ষেপ করিলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪)। বঙ্গবিজেতার নায়ক বাঙ্গালী তরুণ ইন্দ্রনাথ। ঘটনার কাল—আকবরের সময়ে টোডরমল্ল যখন বাংলার শাসনকর্তা। সতীশচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি টোডরমল্লের একান্ত বিশ্বাসভাজন প্রিয়পাত্র সমরসিংহকে কূট কৌশলে হত্যা করিয়া তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক হইয়া বসেন। তাহার পরামর্শদাতা শকুনি নামে এক খল। সমরসিংহের বিধবা পত্নী মহাশ্বেতা এবং কন্যা সরলার মনে শান্তি নাই। মহাশ্বেতার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে: স্বামীহত্যার প্রতিশোধ চাই। তাহাদের সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিল ছদ্মবেশী ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ সমরসিংহের বন্ধুপুত্র, ভালবাসিল সে সরলাকে। এদিকে বাংলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে ইন্দ্রনাথ সে বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ করিয়া টোডরমল্লের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইল। টোডরমল্ল তাহার বীরত্বে মুগ্ধ হইলেন। এদিকে সতীশচন্দ্র তাঁহার খল অনুচর শকুনির বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারাইলেন। শকুনি ধৃত

হইয়া বিচারালয়ে আত্মহত্যা করিল। সরলার সঙ্গে ইন্দ্রনাথের মহা-সমারোহে বিবাহ হইল।

জটিল ঘটনার আবর্তে পড়িয়া 'বঙ্গবিজেতার' চরিত্রগুলি সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। ইহারই মধ্যে ইন্দ্রনাথের বীরত্ব এবং শকুনির ক্রূরতা তবুও কিছুটা ফুটিয়াছে। নায়িকা সরলার বয়স অতি অল্প বলিয়া উপন্যাসের রস জমাইতে সে বেশি কিছু সাহায্য করিতে পারে নাই।

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ'ও (১৮৭৭) ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত। শাহজাহানের শেষ জীবনে তাঁহার রাজ্যলোভাতুর পুত্রদের মধ্যে যখন অন্তর্বিদ্রোহ চলিতেছে তখনকার কথা। পটভূমি ঐতিহাসিক হইলেও 'মাধবীকঙ্কণ' কাহিনীপ্রধান রসোত্তীর্ণ উপন্যাস হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—

বীরনগরের জমিদার বীরেন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যুকালে তাঁহার জমিদারী এবং নাবালক পুত্র নরেন্দ্রনাথের দেখাশুনার ভার তাঁহার দেওয়ান ও বন্ধু নবকুমারের উপর দিয়া গেলেন। কিন্তু নবকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অচিরেই বীরেন্দ্রনাথের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে বঞ্চিত করিলেন। নবকুমারের এক কন্যা ছিল, তাহার নাম হেমলতা। হেমলতাকে নরেন্দ্রনাথ ভালবাসিত। কিন্তু এখানেও নবকুমার বাধা দিলেন। অভিমানে নরেন্দ্রনাথ গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল। যাইবার আগে হেমলতার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার হাতে প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ একটি মাধবীলতার কঙ্কণ পরাইয়া দিয়া গেল। ভাগ্যান্বেষণে রাজমহলে গিয়া নরেন্দ্রনাথ সুজার সৈন্যদলে যোগ দিল। এদিকে শ্রীশচন্দ্রের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়া গেল। নবকুমারের মৃত্যুর পর জামাতা শ্রীশই জমিদারী পাইল। জীবনের নানা ঘটনার পর মথুরায় গোলকনাথের মন্দিরে হেমলতার সহিত নরেন্দ্রনাথের দেখা হইয়া গেল। হেমলতা

তাহাকে পূর্ব প্রণয় বিস্মৃত হইতে বলিয়া মাধবী-কঙ্কণটি ফিরাইয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ মাধবী কঙ্কণ যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসী হইল।

উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথের চরিত্র বেশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে—হেমলতার চরিত্র তেমন পরিস্ফুট নয়।

'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৭৭৯) দুইখানিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুইটি জাতির উত্থান ও পতনের কাহিনী অতি সুন্দরভাবে এই দুইটিতে বর্ণিত হইয়াছে। দুইটিতেই জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেম, রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিদ্যুৎ-চমক এবং যুদ্ধোন্মাদনার চিত্র এমন উজ্জ্বল বাস্তবানুগ হইয়াছে যে পড়িতে গেলে মনে হয় আমরা যেন উহার প্রত্যক্ষ দর্শক। ইতিহাসের এমন সার্থক রূপায়ণ আর কোন ঔপন্যাসিকের মধ্যে দেখা যায় না।

'জীবনপ্রভাতে' ইতিহাস কেবল পটভূমিই নয়, ইতিহাসই গল্পের বিষয়। স্বয়ং শিবাজী ইহার নায়ক, প্রতিনায়ক সম্রাট আওরঙজেব। গল্পের মাধ্যমেই নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে শিবাজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের সংকল্প প্রভৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয়-বিন্যাস, চরিত্র-অঙ্কন—কোথাও ঐতিহাসিক তথ্য বা ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার অপলাপ ঘটে নাই। কিন্তু ঔপন্যাসিকের পক্ষে ঐতিহাসিক চরিত্রের ইতিহাসানুগামিতাই সব নয়, মানবজীবনের সাধারণ সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনারও ইহাতে স্থান থাকা চাই; সেখানে বক্তব্য এই যে এই উপন্যাসের অসাধারণেরাও জীবনের এ সকল সাধারণ অভিজ্ঞতা লইয়া জীবনের পরিচিত ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঐতিহাসিক রচনার অন্তরালে রঘুনাথ-সরযূর যে প্রেমকাহিনীর ধারা বহিয়া গিয়াছে, তাহা রোমান্টিক হইলেও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

'জীবনসন্ধ্যায়' রাজপুত জাতীয় জীবনের গৌরব রবির অস্ত গমনের ছবি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজপুত বীরেরা কেমন করিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, অবশেষে রানা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীবনে কেমন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে—এই উপন্যাস তাহারই চিত্রায়ণ। জীবন-সন্ধ্যায় ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাধান্য। তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীর প্রেমকাহিনী ইহাকে কিছুটা রসসম্পৃক্ত করিয়াছে।

জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যায় রমেশচন্দ্রের গভীর স্বদেশানুরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর বীরত্বের কথা বলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মত তাঁহারও সমান আগ্রহ,—প্রথম দুই উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ দুইজনকেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইয়াছেন।

রমেশচন্দ্র দুইখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছেন, উহাদের নাম যথাক্রমে 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৩)। কাহিনীর ঘটনা-কাল উনবিংশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগ। 'সংসার' পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য জীবনকথা। ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের পথপ্রদর্শক ছিলেন পাদরি লালবিহারী দে। লালবিহারীর Bengal Peasant Life বা Govinda Samanta-এ (১৮৭২) বর্ধমানেব উত্তর অঞ্চলের চাষী-ঘরের নিখুঁত চিত্র আছে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেব স্থলও এই অঞ্চল।"

ঐতিহাসিক উপন্যাস অপেক্ষা সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্র অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। পল্লীর মনোরম শান্ত পরিবেশের মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনকথা অতি সহজ সরল ভাষায় তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে সাধারণের পরিচয় অতি সামান্য, তাঁহার কারবার জমিদার বা উচ্চমধ্যবিত্তকে লইয়া, রমেশচন্দ্র কিন্তু সাধারণ

মধ্যবিত্ত সমাজের কথাই তাঁহার উপন্যাসে বলিয়াছেন। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা তাঁহার উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু ঐবিষয়ে তাঁহার বণিতব্য প্রচারধর্মী হইয়া উঠে নাই। নীতিগত জটিল প্রশ্ন তিনি সতর্কতার সহিত এড়াইয়া গিয়াছেন। 'সংসার' ও 'সমাজে' চরিত্রবাহুল্য ও ঘটনাবৈচিত্র্য নাই বলিয়া এই দুইটিকে উপন্যাস না বলিয়া গল্প বলাই উচিত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়---রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন নির্মল শুভ্র হাস্যরস বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করেন। বঙ্কিম ইহা প্রবর্তন করিলেও ইহার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই আমরা প্রভাত-কুমারের রচনার মধ্যে। গল্প উপন্যাস দুইই ইনি রচনা করিয়াছেন, এবং দুইয়েতেই সৃষ্টি করিয়াছেন প্রচুর পরিমাণে হাস্যরস। ইঁহার হাস্যরসের আর একটা বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহাতে জ্বালা নাই, কারণ উহা ব্যঙ্গাত্মক নয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে অসম্ভব কল্পনা করি, স্বাভাবিকতার পরিধি হইতে যে অসম্ভবতার এলাকার মধ্যে গিয়া পড়ি, সুস্থচিত্তে সেই অসঙ্গতিগুলির কথা ভাবিতে গেলেই উহা হাসির উদ্রেক করে। প্রভাতকুমার বহু গল্পে এই অসঙ্গতিগুলি সহাস্য কৌতুকের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছেন। প্রভাতকুমারের গল্পের মধ্যে গভীর কোন তত্ত্বকথা নাই, চুলচেরা মনোবিশ্লেষণ নাই, কোন নীতি প্রচার নাই। সাধারণ মানুষের বৈচিত্র্যহীন শুষ্ক জীবনের ভিতর তিনি কৌতুকের উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার গল্পের চরিত্র সব চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার বাংলার সব বয়সের পুরুষ নারী। গল্পের স্থান অতি ব্যাপক। বাংলার পল্লী, কলিকাতা, বিহার, কাশী, এলাহাবাদ, সিমলা, এমনকি পাশ্চাত্যের লণ্ডন, এডিনবরা—যেখানে যেখানে শিক্ষিত

বাঙ্গালীর চরিত্র আনাগোনা করিয়াছে সেখানকার দৃশ্য সমেত বাঙ্গালীর চরিত্র তাঁহার শিল্পের ক্যামেরায় ধরা পড়িয়াছে।

প্রভাতকুমার মোট বারোখানা গল্পের বই লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলী' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'গহণার বাক্স' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক' (১৯২৩), 'জামাতা বাবাজী' (১৯৩১)।

এই অধ্যায়ের প্রথমে ছোট গল্পের যে, বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে,—তাহার মানদণ্ড লইয়া বিচার করিলে প্রভাতকুমারের অনেক গল্পই সার্থক ছোট গল্প আখ্যা পাইতে পারে। প্রভাতকুমার মূলতঃ হাস্যরসিক হইলেও অন্য রস সৃষ্টিতেও তিনি সমান দক্ষ। 'আদরিণী' গল্পে জয়রাম মোক্তার এবং তাঁহাব নন্দিনীসমা হস্তিনী 'আদরিণী'কে লইয়া যে মিলন-বিচ্ছেদ-কথা রচিত হইয়াছে তাহা এ দেশের আগমনী-বিজয়ার মতই বাৎসল্যবসমধুর। অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের সূত্র ধরিয়া জীবনে যে কত বড় ট্রাজেডির সৃষ্টি হইতে পারে প্রভাতকুমার অপূর্ব দক্ষতার সহিত তাহা তাঁহার 'দেবী' গল্পে দেখাইয়াছেন। শক্তিসাধক জমিদার শ্বশুর রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন—তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ ষোড়শী দয়াময়ীর মধ্যে আদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার পর মানবী দয়াময়ী দেবীরূপে পূজিতা হইতে লাগিল। ক্রমে দয়াময়ী নিজেও নিজেকে দেবী বলিয়া ভাবিতে শুরু করিল, স্বামীর সঙ্গে পার্থিব সম্বন্ধ রাখা আর তাহার সম্ভব হইল না। পরিবারের একমাত্র বংশধর ভাসুর পুত্র খোকার কঠিন রোগে বৈদ্য ডাকার সময় সে বাধা দিল। তাহার বিশ্বাস নিজের দেবীত্বের প্রভাবেই সে উহাকে রোগমুক্ত করিবে। খোকা বাঁচিল না। পরদিন শ্বশুর পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন

দেবী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রভাতকুমারের আরেকটা সার্থক করুণ গল্প 'মাতৃহীন'। পটভূমি ইংলণ্ড। মধ্যবিত্ত ঘরের ইংরেজ দুহিতা বাঙ্গালী তরুণকে গভীরভাবে ভালবাসিয়াও প্রেমাস্পদের বাপমায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কি করিয়া অপূর্ব নিষ্ঠায় কুমারী-জীবন যাপন করিতে-ছিলেন তাহারই পবিত্র সুন্দর চিত্র। ঘটনাচক্রে বহু বৎসর পরে নায়কের তরুণ পুত্রের কাছেই এই করুণ কাহিনী উদঘাটিত হইল। মহিলার মৃত্যুতে ছেলেটি যেন আবার মাতৃহীন হইল।

প্রভাতকুমারের হাস্যরসাত্মক গল্পগুলির মধ্যে ব্যঙ্গের ভাব নাই বলিয়া যে একেবারে কোথাও নাই, একথা বলা যায় না। তাঁহার একটি গল্প 'রসময়ীর রসিকতার' মধ্যে থিয়োজফিস্ট সম্প্রদায়কে বেশ একটু উপহাস করা হইয়াছে। চল্লিশ বৎসব বয়স্ক মোক্তার ক্ষেত্রমোহন তাহার রুদ্রাণী স্ত্রী বসময়ীর সঙ্গে আঠার বৎসর নিঃসন্তান দুর্বিষহ জীবন যাপন করিবার পর আর সহ্য না হওয়ায় আর একটি বিবাহের উদ্যোগ করিতে রসময়ী তাহার দিদি বিনোদিনীকে লইয়া গিয়া পাত্রীর মাতাকে ঝাটা-পেটা করিয়া আসিল। স্বামীর বিবাহ করিবার বয়স নিঃশেষ না হইলে তাহার মরিবার ইচ্ছা ছিল না, তবুও মরিতে হইল। পত্নীব মৃত্যুর ছয়মাস পর ক্ষেত্রমোহন বিবাহের উদ্যোগ করিতেই রসময়ীর নিজের হাতে লেখা চিঠি আসিতে লাগিল। ভৌতিক কাণ্ড! তৃতীয় চিঠিতে ক্ষেত্রমোহনের বুকে ছুরি বসাইবার ভয় দেখানো হইল। ক্ষেত্রমোহন তাহার পরিচিত থিয়োজফিস্ট মনোহর বাবুর নিকট গিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা মশায়, অশরীরী আত্মা মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে? আপনার থিয়জফি শাস্ত্রে কি বলে?'

মনোহরবাবু একখানি মোটা বই আলমারি হইতে পাড়িয়া এক স্থান খুলিয়া বলিলেন,—এ সম্বন্ধে থিয়জফি শাস্ত্রের মত এই—'মুক্তাত্মাগণ

সাধারণতঃ অশরীরী। কিন্তু কখনও কখনও তাঁরা নিজেকে মেটেরিয়েলাইজ অর্থাৎ জড়দেহসম্পন্ন করে থাকেন। তাঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে বায়ু থেকে, গাছপালা থেকে, ভূমি থেকে, এমন কি কাছাকাছি মানুষের দেহ থেকে আবশ্যকীয় পদার্থগুলি সংগ্রহ করে নিজ দেহ ধারণ করেন। সুতরাং সে-অবস্থায় বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য নয়। আর এও বিবেচনা করুন না, যে হস্ত কলম ধরে চিঠি লিখতে সক্ষম, সে হস্ত ছুরি ধরতে পারবে না কেন ?'

পরে ক্ষেত্রমোহন ঘটনাচক্রে শ্বশুরবাড়িতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহার স্ত্রী মৃত্যুর পূর্বে স্বামীর পুনর্বিবাহের আশঙ্কা করিয়া এইরূপ আরও অনেক চিঠি লিখিয়া তাহার দিদি বিনোদিনীর বাক্সে রাখিয়া গিয়াছে। বুঝা গেল বিনোদিনী খবর রাখিয়া যথাসময়ে সেগুলি ছাড়িত।

'খোকার কাণ্ড'—গল্পেও হরসুন্দর বাবুর উগ্র ধর্মমতকে কিছুটা আঘাত করা হইয়াছে, কিন্তু ঘটনার স্থান-কাল উহাকে শেষে পরম উপভোগ্য একটি রঙ্গে পরিণত করিয়াছে। আসলে প্রভাতকুমার শ্লেষব্যঙ্গহীন কৌতুক রসেরই স্রষ্টা। তিনি শান্ত, স্নিগ্ধ, সংযত, আত্মতৃপ্ত। মার্জিত শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজানুগত্য প্রভাতকুমারের গল্পে একটি বিনম্র শোভনতা আনিয়া দিয়াছে। তাঁহার কৌতুকে তড়িচ্ছটার উগ্রতা না থাকিলেও মনোমুগ্ধকর ঔজ্জ্বল্য আছে। রঙ্গের ক্ষেত্রেও তিনি সিদ্ধ শিল্পী। অপ্রত্যাশিত সিচুয়েশন (ঘটনাচক্র) সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে রঙ্গপ্রবাহ ঢালিতে প্রভাতকুমারের জুড়ী মিলে না। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাস্টার মহাশয় গল্পের—'I do not know।' কিন্তু এই ঘটনা সংস্থান অপ্রত্যাশিত হইলেও অস্বাভাবিক নয়, এবং ইহাই প্রভাতকুমারের বিশেষ কৃতিত্ব। 'বলবান জামাতা'য় শালিকার ধিক্কারে নবনীত কোমল জামাতার উত্তেজিত চিত্তে ব্যায়াম চর্চা করিয়া ক্রমশঃ

পালোয়ান হইয়া ওঠা, পরে লাঠি ও বন্দুক লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, নামগত বিভ্রান্তির ফলে অন্যের বাড়িতে গিয়া উঠা এবং পরিশেষে ইহার রসোজ্জ্বল পরিণতি প্রভাতকুমারের ঘটনাচক্র সৃষ্টির আশ্চর্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। 'বিবাহের বিজ্ঞাপনে' জুয়াচোরের পাল্লায় পড়িয়া রাম আওতারের দুর্গতি চমৎকার ঘটনা-বিন্যাসের আর একটি উদাহরণ।

প্রভাতকুমার উপন্যাস লিখিয়াছেন মোট চৌদ্দখানা। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'রমাসুন্দরী' (১৯০৬), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯০২), 'জীবনের মূল্য' (১৯১৬), 'রত্নদ্বীপ' (১৯১৭), 'সিন্দূর কৌটা' (১৯১৯), 'মনের মানুষ' (১৯২২) ইত্যাদি। উপন্যাস রচনায় প্রভাতকুমার ছোটগল্প রচনার মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার উপন্যাস রোমান্টিক চিত্রধর্মী হইলেও তাহাতে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টিতে যে ব্যাপ্তি, সংহতি, বিশ্লেষণ এবং দ্বন্দ্বসংঘাতের প্রয়োজন তাহার রীতিমত অভাব ঘটিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে কোন সমস্যা নাই, বেদনাজনিত চিত্তভার নাই, আছে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনের অসঙ্গতি ও ভুলভ্রান্তি-জনিত হাস্যোজ্জ্বল ছবি। কোন কোন উপন্যাস তাঁহার ভ্রমণকাহিনী মাত্র। তাঁহার পিতা রেলবিভাগে কাজ করিতেন বলিয়া তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার বহু উপন্যাসে রূপায়িত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী'তে আছে কাশ্মীর ভ্রমণের বর্ণনা, 'সিন্দূর কৌটা'তেও ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনার আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করা যায়। প্রভাতকুমারের বৃহৎ উপন্যাস 'রত্নদ্বীপের' মধ্যে ঘটনাবৈচিত্র্য থাকিলেও এবং এই উপন্যাসে রাখাল, বৌরানী, খগেন, সুরবালা, কনক প্রভৃতি চরিত্র সুপরিস্ফুট হইলেও এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, তাহার অধিকাংশ উপন্যাসেই ছোট গল্পকে ফেনাইয়া ফেনাইয়া বড় করা হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র—বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব এক অতি আকস্মিক মহা বিস্ময়কর ঘটনা। তিনি আসিলেন এবং আসিয়াই তাঁহার অপূর্ব রচনা বলে যাদুকরের মত বাঙালী পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতির আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অন্যান্য সাহিত্য-সাধকের বেলায় তাঁহাদের প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুধাবন কবা যায়, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তি লইয়াই পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র প্রসিদ্ধি-লাভ করিবার পর অনুসন্ধিৎসু পাঠক-সমাজের কাছে তাঁহার সাধনার ইতিকথাও অপ্রকাশিত থাকে নাই। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি গল্প লিখিতে শুরু করেন। বহুকাল অবধি উহার মুদ্রিতরূপ দেখার দুরাশা তাঁহার মনে ছিল না। হাতে-লেখা অবস্থায় খাতায় নিবদ্ধ থাকিয়া—তাঁহার গল্প উপন্যাস রচনা ভাগলপুরে তাঁহার বাল্যবন্ধুদেরই হাতে হাতে ফিরিত। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা—কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প 'মন্দির'। গল্পটি অবশ্য তাঁহার নিজের নামে প্রকাশিত হয় নাই। তিনি বর্মায় থাকিবার সময় ১৯০৫ সালে তাহার এক আত্মীয় এই গল্পটি পুরস্কারের জন্য দাখিল করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় গল্প 'বড়দিদি' 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। অনেকেই এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের আসরে একেবারে জাঁকাইয়া বসিলেন। 'সাহিত্য'-পত্রিকায় তাঁহার 'কাশীনাথ' ও 'বাল্যস্মৃতি' বাহির হইল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'যমুনা' পত্রিকায় লিখিতে শুরু করিলেন। এইখানে বাহির হইল তাঁহার 'চন্দ্রনাথ', 'পথনির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা' এবং 'চরিত্রহীনের' কিছুটা। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি বাঙালী সমাজে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার এই অত্যধিক জনপ্রিয়তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। প্রথমতঃ তাঁহার পূর্বে বাংলা দেশের ঘরোয়া কথা লইয়া এমন করিয়া গল্প উপন্যাস কেহ রচনা করেন নাই। বঙ্কিমের সমসাময়িক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'স্বর্ণলতা'য় এবং রমেশচন্দ্র তাঁহার 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাসে কিছুটা ঘরোয়া কাহিনী পরিবেশন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এমন ব্যাপক ভাবে নয়। শরৎচন্দ্রের সন্ধানী দৃষ্টি একেবারে সমাজের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাই সেখানকার বাস্তব চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের রচিত উপন্যাসে আমরা বিচিত্র পরিবেশে বিভিন্ন রস আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের উপন্যাসেব অধিকাংশ চরিত্রই রাজা বাদশা জমিদার এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের কোন কোন চরিত্র ছাড়া আর সবাই যেন আমাদের দূরের লোক। একমাত্র শরৎচন্দ্র আসিয়াই আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরের সুখ দুঃখ, অনুরাগ বিরাগ, আশা আকাঙ্ক্ষা ঘোঁট দলাদলির ব্যাপার লইয়া কাহিনী রচনা করিয়া শুনাইলেন। সাধাবণ বাঙ্গালী পাঠক তাহাদের নিজেদের সমাজের রূপ সাহিত্যেব দর্পণে প্রতিফলিত দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

তাঁহার জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ, এদেশের নারীহৃদয়ের স্নেহ প্রেম মায়া মমতার ছবি তাঁহার রচনায় অতিদীপ্ত মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙালীর ঘরে ঘরে যেন মা বোন।

তাঁহার রচনা সকলের প্রিয় হইবার অন্য কারণ, তাঁহার চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গী, সহজ সরল সাবলীল ভাষা এবং সার্থক বাস্তবানুগ সংলাপ। এই জন্যই তাঁহার রচিত কোন কাহিনী পড়িতে শুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গে

উহা পাঠকের মনকে টানিতে থাকে এবং শেষ না করা পর্যন্ত ছাড়ে না। কথোপকথনের ভিতর দিয়া যেন রক্তমাংসে-গড়া জীবন্ত মানুষটির দেখা পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার অপরিমেয় মানবপ্রীতি এবং দীনহীন লাঞ্ছিত বঞ্চিতের প্রতি গভীর সহানুভূতি। ইহাই শরৎচন্দ্রের সমস্ত লেখার মূলে প্রেরণা যোগাইয়াছে। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন—'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন দিন ভেবেই পেল না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে'।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে আমরা দেখিতে পাই স্বামিপরিত্যক্তা দরিদ্র দুলের মেয়ে অভাগীর মধ্যে স্বর্গকামনা জাগিয়া উঠিয়াছে। জাগিবার কারণ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের বর্ষীয়সী স্ত্রীর চিতাধূমের মধ্যে সে সাক্ষাৎ স্বর্গের রথটি দেখিতে পাইয়াছে। তাহার ধারণা স্বামীর পায়ের ধূলি এবং ছেলের হাতের আগুন পাইয়াছেন বলিয়াই বামুন-মার চিতাধূমের মধ্যে স্বর্গের রথ নামিয়া আসিয়াছে। তাহার চিতার মধ্যে রথ নামাইয়া আনিতে সাধনা করিয়া সে অকালে প্রাণ দিল, কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ-ব্যবস্থা তাহার চিতা জ্বলিবারই সুযোগ দিল না, কারণ সে গরিব দুলের মেয়ে।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প 'মহেশে'ও পাওয়া যায় এক দুর্ভাগ্য গরিব চাষীর জীবনের করুণ কাহিনী। নিরন্ন কৃষক গফুর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে নিজের ও কন্যার অন্ন সংস্থান করে।

গফুরের একমাত্র সাথী ও বন্ধু তাহার ষাঁড় মহেশ। মহেশ তার অন্নদাতা। কিন্তু এই অন্নদাতা বন্ধুরও সে আহার যোগাইতে পারে না, ব্রাহ্মণ জমিদার গোচারণভূমি আত্মসাৎ করিয়াছে। জমিদার মহেশকে খোঁয়াড়ে দিলে গফুরকে তাহার শেষ সম্বল বাঁধা দিয়া খালাস করিতে হইয়াছে। নিরুপায় গফুর মহেশকে কসাইয়ের কাছে বিক্রী করিতে গিয়া কার্যকালে পারিয়া উঠে নাই। কিন্তু এ অহিন্দু কাণ্ড জমিদারের কানে গেলে গফুরকে ইহার সাজা পাইতে হইয়াছে। গফুর অম্লান বদনে সে শাস্তি গ্রহণ করিয়াছে। ইহার পর ক্ষুধার জ্বালায় মহেশ কিছু অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলে উপায়হীন, অপমানিত, ক্ষুধার্ত গফুর ক্ষোভে, ক্রোধে, উৎপীড়নে জ্ঞানশূন্য হইয়া মহেশকে মারিয়া ফেলিয়াছে। গোবধের জন্য তর্করত্ন তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে তাহার ঘরবাড়ি থালা ঘটি রাখিয়া মেয়ে লইয়া চিরদিনের অবাঞ্ছিত চটকলে কাজ করিতে গিয়াছে। 'মহেশ' শরৎচন্দ্রের একটি অনবদ্য সৃষ্টি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের মধ্যে ইহা অন্যতম।

'বাল্যস্মৃতি' ও 'হরিচরণ' দরিদ্র ভৃত্যের নিপীড়িত জীবন লইয়া রচিত। শুধু এই কয়েকটি গল্পের মধ্যেই নয়,—বঞ্চিতের প্রতি সমবেদনা শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে, এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ছোট গল্পের বইয়ের নাম হইতেছে—'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'কাশীনাথ', 'ছবি', 'হরিলক্ষ্মী' ও 'অনুরাধা'। বড় গল্প—'বড়দিদি', 'পণ্ডিত মশাই', 'পরিণীতা', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'পল্লীসমাজ', 'নিষ্কৃতি', ইত্যাদি। উপন্যাস—'বিরাজ বৌ' 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দেনা পাওনা', 'দত্তা', 'নববিধান', 'পথের দাবী', 'চারি পর্ব শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস', ও 'শেষ প্রশ্ন'।

শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক গল্প উপন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এখানে

সম্ভব নয়—কেবল আভাস দিবার জন্য কয়েকটি লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা। এটি একাধারে ভ্রমণ কাহিনী, আত্মকাহিনী এবং সর্বোপরি উপন্যাস। এই উপন্যাসে আত্মকথার আকারে শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের নায়ক শ্রীকান্তের ভূমিকায় লেখকের নিজেরই ভাবরূপ অনেকটা প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রথম পর্বের চরিত্রগুলি সবই শরৎচন্দ্রের পরিচিত লোকের ছায়া অবলম্বনে অঙ্কিত। এই পর্বের প্রধান দুটি চরিত্র ইন্দ্রনাথ ও অন্নদা দিদি শরৎচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত নহে। এইরূপ দুইটি চরিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্তরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

ইন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি। ইহার কার্যকলাপের মধ্যে এমন একটা শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ আছে যাহাতে ইহাকে অতিমানব বলিতে ইচ্ছা যায়। ভয় বিপদ তুচ্ছ করিয়া সে খেলার মাঠে মারামারি করে, গঙ্গায় উজান বাহিয়া মাছ চুরি করে। অন্ধকারে সাপ বুনো শূয়ার প্রভৃতি বন্য জন্তু সঙ্কুল পথে নির্ভয়ে চলাফেরা করে। মাছ চুরি করিয়া ফিরিবার সময় জেলেরা ধরিতে আসিলে কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা বুঝাইতে সে শ্রীকান্তকে বলিয়াছিল—'আর টের পেলেই বা কি? দ্যাখ শ্রীকান্ত, কিছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে—কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেললে বলে—আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস—গিয়ে ভেসে উঠলেই হলো। এই অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নেই—তারপর সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোর বেলায় সাঁতরে এপারে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ি ফিরে গেলেই বাস।'

ইন্দ্রনাথ শুধু নির্ভীক নয়, সে নির্লিপ্ত। রাত্রিতে শ্রীকান্তদের বাড়ির

ডালিম তলায় যখন এক বিরাট জানোয়ারের আবির্ভাব হইল, কেহ বলে বাঘ, কেহ কেহ বলে ভল্লুক, কেহ বলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ভয়ে সকলে অস্থির তখন ইন্দ্রনাথ আসিয়া মেয়েদের আর্তনাদ, পুরুষের চীৎকার তুচ্ছ করিয়া ডালিম গাছের কাছে গিয়া ছিদাম বহুরূপীকে আবিষ্কার করিল। প্রথম দিকের ভয় এবং শেষের উল্লাস কোন কিছুতেই তাহাকে যোগদান করিতে দেখা গেল না। সে শান্ত, সংযত, নির্লিপ্ত।

সর্বোপরি সে উপচিকীর্ষু। তাহার দুঃসাহসিক কার্যগুলির মূলে নিজের কোন স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার মূলে সর্বদাই কাজ করিয়াছে উপচিকীর্ষা। ইহার প্রেরণায় অসহায় বালককে অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা করিতে সে বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, ঘৃণিত চরিত্র 'নতুনদা'কে রক্ষা করিয়াছে, প্রতিবেশীদের নেকড়ের উৎপাত হইতে মুক্ত করিয়াছে। বিপদসঙ্কুল পথ বাহিয়া সে মাছ চুরি করিতে গিয়াছে—তাহাও অন্নদা দিদিকে সাহায্য করিতে। নিজের বিষয়ে সে সর্বদাই সম্পূর্ণ উদাসীন। 'আর এমনি ভাবেই একদিন অতি প্রত্যূষে সে ঘর বাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গেল, আর আসিল না।'

ইন্দ্রনাথের চরিত্রের সবদিক না হইলেও কোন কোন দিকের আদল মিলে 'রামের সুমতি' গল্পের রামলালের চরিত্রে। ডাক্তারের 'মেকি' কুইনাইনে বৌদির জ্বর সারিতেছে না দেখিয়া সে গিয়া ডাক্তারকে শাসাইল —"ভাল ওষুধ নিয়ে এখুনি এস, দেরি করো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান করেছ, বেশি বড় হয়নি ত—ও কড়ুলের এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে শিশি বোতলগুলি গুঁড়ো করে দিয়ে যাব।'—রামলালের চরিত্র ইন্দ্রনাথের মত অতটা বলিষ্ঠ না হইলেও সারল্যের দিক দিয়া বড়ঃ

মধুর। কৈশোরের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াও সে বৌদির হাতে খাইতে চায়। বৌদি যখন কৃত্রিম তিরস্কার করিয়া বলেন, 'পরের হাতে খেতে তোর লজ্জা করে না ?' তখন উত্তর দেয়,— 'পরের হাত কোথায়, তুমি যে বললে !'' দিগম্বরীর দিকে নিক্ষিপ্ত পেয়ারা বৌদির কপালে লাগিলে সে নিজের কপালে পেয়ারা দিয়া আঘাত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে আঘাতটা বৌদির কতটা লাগিয়াছে। পুকুরে দুটি মাছকে সে কার্তিক গণেশ নাম দেয়। দস্যিপনার সঙ্গে সারল্য এবং বৌদির প্রতি ভালবাসার সমন্বয়ে রামলালের চরিত্র পরম চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

এই গল্পে শরৎচন্দ্র বাংলার যৌথ পরিবারের শক্তি এবং নারীহৃদয়ের মাধুর্য একসঙ্গে দেখাইয়াছেন। রামলালের বৌদি নারায়ণী তাহার বৈমাত্রেয় বড় ভাই শ্যামলালের স্ত্রী ; মাতৃহীন রামলালকে মানুষ করিয়াছেন—তিনি নিজের প্রথম সন্তানের স্নেহ দিয়া। এইজন্যই নারায়ণীর চরিত্র পাঠকের এত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

স্নেহশীলা বঙ্গনারীর স্নেহ আপন পরের বিচার করে না,—স্নেহযোগ্য কোন পাত্র পাইলেই তাহার দিকে স্বতঃ উৎসারিত হয়। 'মেজদিদি' গল্পে আমরা দেখি কাদম্বিনীর বৈমাত্রেয় ভাই মাতৃহীন কেষ্টকে কঠিন শ্রমসাধ্য কার্যে ক্লান্ত দেখিয়া তাহার জা হেমাঙ্গিনী পরমস্নেহে ডাকিতেছে, 'ওর মত আমিও তোমার দিদি হই কেষ্ট—এসো আমার সঙ্গে।''

সাধারণে যেখানে প্রতিকূল অথবা উদাসীন ব্যবহার আশা করে সেখানে যদি অনুকূল স্নেহব্যাকুল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তখন যাহার মধ্যে আমরা ঐ গুণটি দেখিতে পাই সে আমাদের চক্ষে মহান্ হইয়া উঠে। মহত্ত্বের ছবি আঁকিবার এই সহজ কৌশলটি শরৎচন্দ্র শুধু 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি'তে নয়,—'বিন্দুর ছেলে' 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বিপ্রদাস' ইত্যাদিতে প্রয়োগ করিয়াছেন। 'বৈকুণ্ঠের উইলে' আমরা দেখিতে পাই

—ভবানীর স্নেহ তাহার সপত্নীপুত্র গোকুলের উপর অবিরামধারায় প্রচুর বর্ষিত হইয়াছে। জয়রাম বাড়ুয্যে যখন ভবানীর নিজের পুত্র বিনোদের পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া এবং গোকুলের ফেল করার কথা বলিতে আসিয়াছেন তখন ভবানী গোকুলকে বুকে টানিয়া বলিতেছে,—এবার ভাল করিয়া পড়িলে এও আমার সামনের বৎসর ফার্স্ট হবে। বাড়ুয্যের এই সময়ের মনোভাব ব্যক্ত করিতে শরৎচন্দ্রকে বলিতে হইয়াছে—সপত্নীপুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ তাঁহার কাছে এমন স্বতঃসিদ্ধ যে কোথাও কোন ক্ষেত্রে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, সে কথাও তাঁহার মনে উদয় হইল না।" ব্যতিক্রম দেখিলে আমরাও বিস্মিত হই, কিন্তু তবুও বাংলার যৌথ পরিবারে এইরূপ মধুর ব্যতিক্রম আছে, এবং শরৎচন্দ্র তাহারই ছবি অতি উজ্জ্বল করিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া আমাদের মুগ্ধ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের যৌথ পরিবারের চিত্র লইয়া রচিত গল্প উপন্যাসগুলির উপজীব্য প্রেম নহে,—স্নেহ প্রীতি, বাৎসল্য ইত্যাদি। বাংলায় পরগাছার মত এক শ্রেণীর লোক বাহির হইতে উড়িয়া আসিয়া যৌথ পরিবারে জুড়িয়া বসে এবং শেষে ঐ সংসারেই ভাঙন ধরাইবার চেষ্টা করে—শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহা এড়ায় নাই। 'রামের সুমতি'র দিগম্বরী এবং 'বিন্দুর ছেলে'র এলোকেশী ঐ শ্রেণীর চরিত্র। গোটা সমাজের দুর্নীতির চিত্র আঁকিয়াছেন তিনি 'বামুনের মেয়ে' এবং 'পল্লী সমাজে'। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি-ক্যামেরায় যে বাংলার কত বিচিত্র চরিত্র ধরা পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 'স্বামী'-গল্পে সৌদামিনীর স্বামী পারিবারিক শত অনাদর অবহেলার মধ্যেও আত্মসমাহিত, অবিচল। স্ত্রী সৌদামিনী তাহার প্রতি কৃত অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সে বলিতেছে "আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নাই।

মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন'। বড় গল্প 'পণ্ডিত মশাই'য়ে বৃন্দাবনের অপত্য স্নেহ Sublimation (উদগতি) লাভ করিয়াছে। তাহার একমাত্র পুত্র চরণ কলেরায় মারা গেলে কুসুম যখন শোকে পোড়াকাঠ হইয়া গেল তখন সে তাহাকে বলিল— "চরণকে যে তুমি কত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাকছি। সে তোমার মরে নি, হারায় নি, শুধু লুকিয়ে আছে—একবার ভাল করে চেয়ে দেখতে শিখলেই দেখতে পাবে যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমার চরণও তাদের সঙ্গে আছে'। 'একাদশী বৈবাগী' গল্পের নায়ক নিম্নজাতীয় কৃপণ, কুশীদজীবী, কাহারও এক পয়সা স্নুদ ছাড়ে না বটে, তবে পদস্খলিতা ভগিনীকে আশ্রয় দিতে সে জাতি, কুল, গ্রাম, সমাজ সবকিছু ত্যাগ করিতে পারে। শরৎচন্দ্র তাহার গল্প উপন্যাসের অনেক চরিত্রের মধ্য দিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন —আমরা যাহাদের মন্দ বলিয়া ঘৃণা করি তাহাদের সবটুকুই মন্দ নয়, আবার ভাল বলিয়া যাহাদের মাথায় তুলি তাহাদেরও সবটুকুই ভাল নয়। শরৎ-সাহিত্যে মাত্র দুইটি আদর্শচরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—তাহার একটি হইতেছে 'পল্লীসমাজে'র রমেশ, আর একটি 'পথেরদাবী'র সব্যসাচী।

শরৎ-সাহিত্যে নারীর স্থান সর্ব উচ্চে। তিনি দেখাইয়াছেন—নারীর পরিচয় ইহা নহে যে সে সাধ্বী স্ত্রী,—তাহার আসল পরিচয় এই যে সে নারী।

———

কাব্য ও কবিতা

মধুসূদন দত্ত

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা কবিতা মাত্র দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল—ইহার একটি হইতেছে মঙ্গলকাব্য, আর একটি হইতেছে বৈষ্ণব পদাবলী। সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া—একই ধরনের কাহিনী এবং একই বিষয় অবলম্বনে রচিত পদ শুনিয়া জনচিত্ত ক্লান্তিবোধ করিতেছিল। কাব্য-কবিতায় নূতন রস আস্বাদন করিবার জন্য বাঙ্গালী যেন উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল। এদিকে দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের রস আস্বাদন করিবার সুযোগও শিক্ষিত বাঙ্গালীর মিলিল। ইহাদের মধ্য হইতেই কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি পাশ্চাত্য ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কিছু নূতন রস পরিবেশনে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই কার্যে প্রথম অগ্রসর হইলেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত। রচনা-রীতির দিক দিয়া মধ্যযুগের ভঙ্গি তিনি একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু ভাবের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে তিনিই আধুনিক যুগের প্রবর্তক। তাঁহার ঈশ্বরবোধ, দেশাত্মবোধ, প্রকৃতিবোধ, সামাজিকবোধ সবই আধুনিক ভাবের বাহক।

তাঁহার পর তাঁহারই শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করিতে হয়। ইনি ভারতের অতীত শৌর্যবীর্য ও দেশানুরাগের কয়েকটি কাহিনী শুনাইয়া বাঙালী পাঠককে আনন্দ দিয়াছেন। কিন্তু বাংলা কাব্য

সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ আধুনিকতা আনিয়াছেন মধুসূদন। তিনি সেকালের ইংরেজীনবীসদের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কালেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁহাব প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। পরে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কবিয়া শিবপুর বিশপস্ কলেজে ইউরোপীয় অধ্যাপক-গণের নিকট তিনি গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি ইউরোপের যাবতীয় প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করেন। তাঁহার পাশ্চাত্য সাহিত্যলব্ধ জ্ঞান পরবর্তী কালে তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করেন। এবং তাহারই ফলে বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যজ্ঞানে পুষ্ট মধুসূদনেব সহজাত কবিত্ব শক্তি প্রথমে ইংরেজি সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত হয়। মাদ্রাজে শিক্ষকতা করিবার সময় তিনি 'ক্যাপটিভ লেডি' নামক কাব্য এবং 'ভিশনস্ অব্ দি পাস্ট' ইত্যাদি কবিতা রচনা করেন। 'ক্যাপটিভ লেডি' নামক কাব্য তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস বসাকের নিকট পাঠাইয়া—একখানা পত্রে তাঁহাকে লেখেন "কোন ইংরাজ পণ্ডিতকে দেখাইয়া বইখানা একবার যাচাই করিয়া লইও, এবং এই বই সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আমাকে জানাইও।"

মধুসূদনের কথা মত গৌবদাস বইখানি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে পড়িতে দেন। মিস্টাব বেথুন বইখানা পড়িয়া গৌবদাসকে যাহা জানান তাহার মর্ম এই —"বিদেশী ভাষায় গ্রন্থ রচনা কবিয়া কেহ কোনদিন বড় হইতে পারে নাই,– আপনার বন্ধু—ইংবেজি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া যে শিক্ষা সংস্কৃতি লাভ কবিয়াছেন উহা মাতৃভাষাব সেবায় নিয়োজিত করিলে তিনি অক্ষয় যশের অধিকাবী হইবেন"।

ইহার পরই মধুসূদনের মাতৃভাষায় কাব্য রচনার আগ্রহ জাগে। মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে তিনি বাংলা নাটক রচনায় হাত দেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ

'তিলোত্তমা সম্ভব' প্রকাশিত হয়। মহাভারতের সুন্দ উপসুন্দের কাহিনী লইয়া এই কাব্য রচিত। সুন্দ উপসুন্দ দুই ভাই—মহা পরাক্রান্ত অসুর। ইহাদের অত্যাচারে স্বর্গরাজ্য টলমল, দেবতারা বিপন্ন। ব্রহ্মা দেবরাজ্য হইতে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য আহরণ করিয়া তিলোত্তমা নামে এক অপূর্বসুন্দরী নারী সৃষ্টি করিয়া দুই ভায়ের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিলেন। ইহারই ফলে তাহারা মারা গেল।

সমগ্র 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যটি মধুসূদন একটি নূতন ছন্দে রচনা করিলেন - ইহার নাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই ছন্দের প্রয়োগ পরীক্ষা কবেন তিনি প্রথম 'পদ্মাবতী' নাটকে। এই নাটকেব কোন কোন অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়। মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যরচনা রীতি আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন বাংলা কবিতা যতদিন পয়ার ত্রিপদী ছন্দের বন্ধনে বাঁধা থাকিবে ততদিন ইহার ভাব ভাষা কোনটাই অবাধগতি হইতে পারিবে না। পয়ারে একে ত টানিয়া টানিয়া পডিতে হয়, তাহাব উপর প্রতি চরণের শেষে একবার করিয়া থামিতে হয়, যেমন —

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বাংলা কবিতার এই শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপটি দেখিয়া তিনি অন্তবে কতটা পীড়িত বোধ করিতেন তাহা তাহার অমিত্রাক্ষরে রচিত 'মিত্রাক্ষর' নামক চতুর্দশপদী কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে।

যাহা হউক কবি মধুসূদন—বাংলা কবিতার এ-বেড়ি ভাঙ্গিতে আত্ম-

নিয়োগ করিয়া মিল্টনের—'ব্লাঙ্ক ভার্স' অনুসরণে বাংলার পয়ারকেই প্রবহমান অমিত্রাক্ষরে রূপান্তরিত করিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে একদিন জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে এ-বিষয়ে মধুসূদনের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তিনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন—'আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতেই মিত্রাক্ষর রূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।'

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মধুসূদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব' কয়েকজন রসগ্রাহী ব্যতীত সাধারণের নিকট তেমন প্রশংসা লাভ করিতে পারে নাই। তবে এ-কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় প্রশংসা করিবার মত অনেক কিছু ইহাতে আছে। উদাহরণ স্বরূপ কাব্যের প্রথমেই তিনি শব্দ-উপমা এবং ছন্দের সাহায্যে ধবল-গিরি প্রদেশের নির্জন-নিঃসঙ্গতা, অটল গাম্ভীর্য এবং অভ্রভেদী মহিমার যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়—

> ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে
> অভ্রভেদী, দেবতাত্মা, ভীষণ দর্শন ;
> সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল,
> যেন উর্ধ্ববাহু সদা, শুভ্র বেশধারী,
> নিমগ্ন তপঃ সাগরে ব্যোমকেশ শূলী
> যোগিকুল ধ্যেয় যোগী।

তিলোত্তমা কাব্যের পর অমিত্রাক্ষর ছন্দে মধুসূদন যে দ্বিতীয় কাব্যখানি রচনা করিলেন—তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। উহার নাম 'মেঘনাদ বধ'। ইহাতে লঙ্কার যুদ্ধে বীর ইন্দ্রজিৎ সেনাপতির পদ লাভ

করিয়াও অন্যায়-যুদ্ধে লক্ষ্মণ কর্তৃক কিরূপে নিহত হইলেন—এবং পুত্রশোকোন্মত্ত রাবণ প্রতিহিংসা লইতে কিরূপে লক্ষ্মণের বুকে শক্তিশেল নিক্ষেপ করিলেন প্রধানতঃ তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। কাহিনীটি রামায়ণ হইতে গৃহীত হইলেও চরিত্র পরিকল্পনায় মূল রামায়ণের সঙ্গে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। মধুসূদনের কল্পনায় রাবণ, মেঘনাদ, বিভীষণ, প্রমীলা, সরমা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা—মানুষ। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পড়িলে ইহাদের সকলের মধ্যেই মনুষ্যসুলভ ক্রোধ, বেদনা, প্রেম, বাৎসল্য, মহত্ত্ব প্রভৃতি ভাব আত্মপ্রকাশ করে। কাব্যের নায়ক রাবণ 'দেবদৈত্যনরত্রাস'—ভুবনবিজয়ী বীর। তাঁহার শৌর্য কবিকে বীররসাত্মক কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে—"......the idea of Ravan elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow."—কিন্তু কবির অতি প্রিয় মানসপুত্র হইতেছেন—ইন্দ্রজিৎ। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত কবির পত্রে পাই —"I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit,"—অন্য পত্রে পাই "... ..It costs me many a tear to kill him," প্রমীলার চরিত্রও বীরত্ব ও প্রেমে অনবদ্য। কবির চক্ষে রাম লক্ষ্মণ দৈবের অনুগ্রহভিখারী কাপুরুষ।

মহাকাব্যের রীতি অনুসরণে মধুসূদন কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে আবাহন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছেন—

> সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
> বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণি
> কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
> পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
> রাঘবারি ?......................

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি—! যেমতি মাতঃ, বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি !

দেবীর কৃপা প্রার্থনার সঙ্গে কবির বাসনাও এই আবাহনের সঙ্গে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কবি বলিয়াছেন—'গাহিব, মা বীররসে ভাসি মহাগীত।'' কবি বীররস সৃষ্টি করিতে চাহিলেও কাব্য তাঁহার পুরোপুরি বীররসাত্মক হয় নাই। এ-যুগে অবিমিশ্র বীররসের কাব্য রচনা সম্ভব নয়, তাই কবি বীররসের কাঠিন্য করুণ রসের কোমলতার দ্বারা সিক্ত করিয়া লইয়াছেন। কাহিনীর প্রথমেই কবি রাবণের যে মূর্তিটি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা অতীব করুণ—

এ হেন সভায় বসে রক্ষকুলপতি
বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ব্যক্তিহৃদয়ের বাৎসল্যজনিত এই ক্ষণিকের দুর্বলতা দূর করিয়া তাঁহার বীরহৃদয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দূতের মুখে তিনি পুত্রের বীরত্বের কথা শুনিতে চান—

"কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী।

দূতের মুখের কথা শুনিয়াও তৃপ্তি হইল না। তিনি তখন বলিলেন—

"......চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল দেখি জুড়াই নয়নে।"

আবার ধাত্রী প্রভাষার মুখে বীরবাহুর পতন সংবাদ শুনিয়া—

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে ; পদতলে পড়ি শোভিল কুন্তল
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়।"

ইহাও কম বীররসদ্যোতক নয়। ইন্দ্রজিৎ পিতার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া বসিলেন,—

অনুমতি দেহ ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলা প্রমোদ-উদ্যান হইতে লঙ্কাপুরীতে গমন করিতে চাহিলে তাহার সখী যখন রাঘবসৈন্যের ভয় দেখাইতেছে তখন সে বলিতেছে—

"কি কহিলি বাসন্তি ?.........
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃকুলবধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে।"

সপ্তম সর্গে যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যেও বীররসের কথা পাওয়া যায়। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকে আঘাত করিবার সময়ে পাই—

প্রহারিলা ভীম গদা গজবাজ শিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরূহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে!

দূরে লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাবণ যে-ভাবে তাহার দিকে ছুটিয়া চলিতেছেন তাহার বর্ণনায় পাই—

যথা হেরি দূরে
কপোত বিস্তারি পাখা ধায় বাজপতি
অম্বরে; চলিল রক্ষ হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে। ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।

অনেকে বলেন মধুসূদন 'বীর রসে ভাসি মহাগীত' গাহিতে চাহিলেও এ-কাব্য তাঁহার করুণরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। এ-উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য নয়—উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কবি মধুসূদন এই কাব্যে যে কেবল বীররস, করুণ রসেরই সার্থক ছবি আঁকিয়াছেন তাহাই নহে, প্রকৃতি বর্ণনায়ও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গের আরম্ভে সন্ধ্যার বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধূলি,
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী
মুদিলা সরসে আঁখি বিরস বদনা
নলিনী; কুজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ গৃহে গাভিবৃন্দ ধায় হাম্বারবে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে যুদ্ধের ভেরী নাদ ছাড়া বীণার করুণ সুরের ঝঙ্কারও সৃষ্টি করিতে পারে এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে—সীতা-সরমার কথোপকথনের মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'মেঘনাদ বধ' রচনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন মিত্রছন্দে সম্পূর্ণ নূতন ধাঁচে বৈষ্ণব পদাবলীর মত কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। যে-গ্রন্থে উহা সংকলিত হয় তাহার নাম 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। বৈষ্ণব পদাবলীর মত ভক্তির উচ্ছ্বাস ইহাতে নাই,—আছে ভাবের আবেগ। আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়াও যে ব্রজাঙ্গনা প্রেম লইয়া কবিতা লেখা যায়, মধুসূদন ইহাতে তাহাই দেখাইয়াছেন—

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলীরে
রাধিকা-রমণ!
চল, সখি ত্বরা করি দেখি গে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন॥

ইহার পর প্রকাশিত হয় মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। ইতালীর কবি ওভিদের Heroic Epitles পাঠ করিয়া মধুসূদন এই কাব্য রচনার প্রেরণা পান। বীরাঙ্গনা কাব্য পত্রাকারে রচিত কতকগুলি কবিতার সঙ্কলন। এক এক পত্রে এক এক নায়িকা তাঁহার হৃদয়াবেগ তাঁহার প্রেমাস্পদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছেন। ওভিদের গ্রন্থে এইরূপ একুশ খানা কবিতায় লেখা পত্র পাওয়া যায়। মধুসূদনেরও ইচ্ছা ছিল—এইরূপ একুশটি পত্র রচনা করা। কিন্তু এগারটির বেশি তিনি আর লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। বীরাঙ্গনা কাব্যের এগারটি সর্গে এগারখানি চিঠি এইরূপ—'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'সোমের প্রতি তারা', 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী', 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী', 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা', 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী', 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী',

'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা', 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী', 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' এবং 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'।

একমাত্র 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'—ছাড়া অন্যান্য পত্রে নারীর সাধারণ হৃদয়বেদনার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে—কেবল ঐটিতেই বীরাঙ্গনা সুলভ তেজের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী নীলধ্বজ পুত্রহন্তা অর্জুন ও কৃষ্ণকে নিজ প্রাসাদে অভিনন্দিত করিতে যাইতেছেন দেখিয়া জনা স্বামীর নিকট এইরূপ পত্র প্রেরণ করিলেন—

'বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হ্রেষে অশ্ব ; গর্জে গজ ; উড়িছে আকাশে—
রাজকেতু ; মুহুর্মূহু হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ; কিন্তু কোন হেতু ?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে,
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে ?

বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করিয়াও বিদেশী কাব্যসাহিত্যে যথেষ্ট বুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও মধুসূদনের মন কেমন দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী ছিল, তাহার প্রমাণ মিলে তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাহাকে 'সনেট' বলে, এগুলি তাই। সনেট মোট চৌদ্দ লাইনে সম্পূর্ণ হয় বলিয়া ইহার নাম রাখা হইয়াছে চতুর্দশপদী কবিতা।

ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য সুদূর বিদেশে অবস্থান কালে কবি এইগুলি রচনা করেন। ইহাদের মোট সংখ্যা ১১০। বিদেশে অর্থকৃচ্ছতা ও নানা দুঃখ দুর্দশার মধ্যে থাকায় দীর্ঘকালসাপেক্ষ কোন রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই, তাঁহার মন-আকাশে খণ্ড ছিন্ন মেঘের মত যে-সকল

চিন্তার উদয় হইত, তাহা লইয়াই তিনি এই সনেটগুলি রচনা করেন। এগুলি তাঁহার নিভৃত মনের কথা। ইহাব মধ্য দিয়াই মধুসূদনের ভিতরকার আসল মানুষটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা, বাংলার নদনদী, পথঘাট, মাস, পাল পার্বণ, এমন কি বটগাছ, 'বউ কথা কও'-পাখিটি পর্যন্ত তিনি কত ভালবাসিতেন, বাংলার কবি মনীষী মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি কত শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন, এক কথায় পাশ্চাত্য বেশভূষায় মণ্ডিত হইয়াও ভিতরে ভিতরে তিনি কেমন স্বদেশ-স্বজাতিপ্রিয় বাঙ্গালী ছিলেন চতুর্দশপদী কবিতাবলী তাহারই স্বাক্ষর বহন করে। চতুর্দশপদী 'বঙ্গভাষা'য় তিনি লিখিয়াছেন—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;
তা সবে (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ—
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

বিদ্যাসাগরের মহানুভবতার কথা মনে হওয়ায় লিখিয়াছেন—

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু !—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।

বাল্যের শতস্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদকে তিনি ভুলিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন—

সতত, হে নদ ! তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে
সতত যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়ামন্ত্রধ্বনি, তব কলকলে—
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !

বিহারীলাল চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ তাহার আধুনিক সাহিত্যে বিহারীলাল নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।" এখানে উষালোক হইতেছে বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের পূর্বাভাস, আর ভোরের পাখি হইতেছেন কবি বিহারীলাল। এ কবির কবিতা—আত্মগত, মন্ময়। সে-যুগের অন্যান্য কবিদের সহিত বিহারীলালের পার্থক্য দেখাইতে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, "বিহারীলাল তখন ইংরেজী ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদের ন্যায় পৌরাণিক আখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।"

'বঙ্গসুন্দরী'তে আমরা কবি বিহারীলালের নিজের মনের কথাই পাই—

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা!
উঃ কি অনন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বিহারীলালই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতা প্রবর্তিত করিলেন। বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যের রুদ্ধ কক্ষ হইতে মুক্তি পাইয়া বিহারীলালের রোমান্টিক গীতি কবিতার মুক্তাকাশে যেন স্বস্তিতে নিঃশ্বাস লইতে পারিলেন। বিহারীলালের মনে বাংলা কাব্যের ক্লাসিক্যাল রীতির

বিরুদ্ধে যে একটা অসন্তোষের ভাব ছিল তাহা তাঁহার কবিতাতেই পাওয়া যায়—

"এখন ভাবতে ভাই,
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোসে অট্ট হাসে রে কে কাল ছায়া
হা ধিক! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কিমুখো আয়া?

মেঘনাদ বধের কবি মধুসূদন কিন্তু কেবল ক্লাসিক্যাল রসই সৃষ্টি করেন নাই। তাহার চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে আত্মকথাই ব্যক্ত হইয়াছে, তবে উহার সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় নাই। মধ্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলীও সঙ্গীতধর্মী, কিন্তু তাহাতে গোষ্ঠীমনোভাবই প্রধান, ব্যক্তি-মনোভাব গৌণ, তাই সকল দিক বিবেচনা করিয়া এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় বিহারীলালের কাব্যেই বাংলা গীতিকবিতার মৌলিক স্ফূর্তি প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বিহারীলাল শুধু বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকাব্যের প্রবর্তকই নন, মনে প্রাণে তিনি কবি ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বিহারী বাবু সর্বদাই কবিত্ব মণ্ডলে থাকিতেন, তাহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব মাখা থাকিত; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বড় কবি ছিলেন।" বস্তুতঃ ভাবাবেগে তাঁহার হৃদয় সর্বদা আকুলি বিকুলি করিত,—অন্তরের সমগ্র তীব্র অনুভূতি তিনি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার মনে যেন ক্ষোভ ছিল। কবি নিজেই বলিয়াছেন—'কেবল হৃদয় দেখি দেখাইতে পারি নে' অথচ দেখাইবার

জন্য ব্যগ্রতা ছিল প্রবল, এবং এই অত্যধিক ব্যগ্রতার জন্যই উপযুক্ত ভাষা বা ছন্দ নির্বাচনের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে পারিতেন না। ফলে তাহার কবিতা স্থানে স্থানে যেমন সুমধুর হইয়াছে, স্থানে স্থানে হইয়াছে তেমনি শ্রুতিকটু। উদাহরণ স্বরূপ—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর নদীর জলে ;
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনী দলে।

বঙ্গসুন্দরী'র 'সুরবালা'-সর্গের এই পংক্তিগুলি ছন্দ ও ভাষাগুণে যেমন শ্রুতিমধুর, 'নিসর্গ দর্শনে'র অন্তর্গত 'সমুদ্র দর্শন' ও 'নভোমণ্ডলে'র কবিতায় 'তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি'র উপমা এবং 'গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই' ও লাফায়ে 'লাফায়ে ওঠে লঙ্ঘি জলধরে'র শব্দ নির্বাচন তেমনি কল্পনা ও শ্রবণের পীড়াদায়ক।

বিহারীলালের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। বৎসরাধিক পরে পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর কবি তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ দাসের সহিত মিলিত হইয়া—'সাহিত্য-সংক্রান্তি' নামে একটি পত্রিকা বাহির করেন! ইহাতেও কবির কয়েকটি কবিতা বাহির হয়। 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকা ইহার পরে বাহির হয়। বিহারীলাল প্রথমে ইহার পৃষ্ঠপোষক এবং পরে ইহার স্বত্বাধিকারী হ'ন। তাঁহার অধিকাংশ রচনা হইতে মুদ্রিত হইয়া পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বিহারীলালের 'বন্ধু বিয়োগ', 'প্রেম প্রবাহিনী' ও 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব অতি স্পষ্ট। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যেই দেখা যায় কবি নিজের পথটি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারদা

মঙ্গল'। অন্যান্য কাব্যের নাম 'স্বপ্ন দর্শন', 'সংগীত শতক', 'বাউল বিংশতি', 'সাধের আসন', 'মায়াদেবী'—ইত্যাদি।

সারদা মঙ্গল কাব্যখানির রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'সারদা মঙ্গলে কবি যাহা গাহিতেছেন, তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে। ····· সরস্বতীর সম্বন্ধে সাধারণতঃ পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে, কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র। কবি যে সরস্বতীর বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নানা আকারে নানা ভাবে লোকের নিকট উদিত হ'ন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন।'

প্রথম সর্গে—উষা-বন্দনার মঙ্গল গীতে 'সারদা মঙ্গলের সূচনা। রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তরুণী উষা পূর্ব গগনের তোরণদ্বারে আবির্ভূত হইতেছেন, তাহার—

"চরণ-কমলে লেখা
আধ আধ রবি-রেখা,
সর্বাঙ্গে গোলাপ-আভা
সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।"

পরক্ষণেই দেখা যায় কবির হৃদয়কমল যে বীণাপাণির চরণ স্পর্শ কামনা করিতেছে—তিনি প্রকাশিত হইলেন ঐ উষাদেবীর মধ্যেই। তাঁহার—

"কপোলে সুধাংশু ভাস
অধরে অরুণ হাস,
নয়নে করুণা-সিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে।"

ইহার পর তমসাতীরে ভাববিহ্বল বাল্মীকির নিকট যখন তিনি আবির্ভূত হইলেন তখনও দেখা যায় উষাদেবীর সহিত তাঁহার অভিন্নতা বর্তমান।

'করে ইন্দ্রধনু বালা
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝলমলে কানন ;
কর্ণে কিরণের দুল,
দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়া আনন।'

সারদা করুণারূপিণী হইয়া বাল্মীকির নিকট দেখা দিলেন। ইহার পরে ব্রহ্মার মানসসরোবরে স্বর্ণপদ্মের উপর অধিষ্ঠিতা অনন্তসৌন্দর্যলক্ষ্মী ষোড়শী মূর্তিতে তাঁহার প্রকাশ। কবি তাঁহাকে দেখিয়া গাহিয়াছেন—

'ভক্তি ভাবে এক তানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।'

ইহার পর হইতেই কবির মনে দেখা দিয়াছে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। কখনও অভিমান, কখনও বিরহ, কখনও আনন্দ, কখনও বেদনা, কখনও ভর্ৎসনা, কখনও স্তব। অবশেষে হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী সারদার সহিত মিলন হইলে কবি হিমালয়কে ধন্যবাদ দিতে জানাইলেন—

'হে প্রশান্ত গিরি ভূমি
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে।'

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের

আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বিহারীলালের শেষ কাব্য 'সাধের আসন' সারদামঙ্গলেরই পরিশিষ্টের মত। এই কাব্যখানি রচনার সামান্য একটু ইতিহাস আছে। বিহারীলালের কবিতার বিদগ্ধ পাঠিকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী কবিকে একটি পশমের আসন বুনিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

'হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ছ'নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও ?"

প্রশ্নটি অবশ্য 'সারদা মঙ্গলে'র অন্তর্নিহিত ধ্যানী কবিসত্তাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছিল। কবি ইহার উত্তর স্বরূপ 'সাধের আসন' কাব্যখানি রচনা করেন। এ-রচনা পাঠ করিয়াও প্রশ্নকর্ত্রী অবশ্য যে-তিমিরে সে-তিমিরেই রহিয়া গিয়াছেন, কারণ কবি ইহাতে লিখিয়াছেন—

'কাহার ধেয়াই, দেবি,
নিজে আমি জানি নে।'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—"মহাকবির সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গ কবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার

ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখনও রোদন করিব না।" ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষীর এই উক্তি হইতেই হেমচন্দ্রের কাব্যকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা কবিয়া লইতে পারা যায়।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তা তরঙ্গিনী' ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ভ্রাতা রামকমল এবং হেমচন্দ্রের বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ পর পর আত্মহত্যা কবেন ; কবি ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন, এবং ইহারই ফলে 'চিন্তা তরঙ্গিনী' রচিত হয়। গ্রন্থের মূল বক্তব্য—'পৃথিবীব সাব পদার্থ মনুষ্য, মনুষ্যের সার পদার্থ মন'। হেমচন্দ্রের প্রথম রচনা হইলেও ইহা কবিত্ববর্জিত নহে। একটু নমুনা—

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল।
রাঙা রবি ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান।
লোহিত বরণ ভানু অস্তাচলে যান॥

বুঝিতে কষ্ট হয় না, রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং রঙ্গলালের প্রভাব কিছুটা পড়িয়াছে। হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্য—'বীরবাহু' (১৮৬৪)। কবি নিজেই লিখিয়াছেন—'উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক', কোনো ইতিহাসমূলক নহে। পুবাকালে হিন্দুতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থে কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে'। এই কাব্যের মধ্যেই প্রথম হেমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ এবং ভাষা ও ছন্দের উপর আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মুখবন্ধ হইতে দুই চার লাইন এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

আর কি সেদিন হবে জগৎ জুড়িয়া যবে
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস শুনায়ে মধুর ভাষ
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত॥

'বীরবাহু'র কাহিনী এইরূপ—কনোজের যুবরাজ বীরবাহু পত্নী হেমলতার সঙ্গে উদ্যান ভ্রমণের সময় সংবাদ পাইলেন রাজ্যের দ্বারদেশে পাঠান শত্রু। তাহারা রাজ্য আক্রমণে উদ্যত। পিতার অনুমতি লইয়া যুদ্ধে গিয়া তিনি আহত হইলেন। পাঠানসৈন্য রাজপুরী লুণ্ঠন করিয়া হেমলতাকে লইয়া গেল। বীরবাহু তাঁর শ্বশুর কলিঙ্গরাজের সৈন্য সাহায্যে জলপথে পাঠান দমন করিতে চলিলেন। প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে জাহাজ ডুবিয়া গেল। বীরবাহু কোন মতে রক্ষা পাইয়া পাঠান সুলতানকে বধ করিয়া হেমলতাকে লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন।

হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি এবং স্বাধীনপ্রিয়তা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে তাঁহার 'ভারত সঙ্গীত' নামক কবিতায়।

বাজরে শিঙ্গা, বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।

'দশ মহাবিদ্যা' ধর্মভাবমূলক উচ্চাঙ্গের কবিতা। এই কাব্যে নূতন এক ছন্দে লেখা শিবের বিলাপ অতি অপূর্ব—

'রে সতি! রে সতি কান্দিজ পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ মগ্ন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥'

হেমচন্দ্রের প্রধানতম কবিকৃতি 'বৃত্রসংহাব'। মধুসূদনের মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া তিনি এই কাব্য রচনায় প্রেরণা পান। চরিত্র পরিকল্পনা ও ঘটনা বিন্যাসেব দিক দিয়া হেমচন্দ্র মধুসূদনকেই অনুসরণ করিতে চেষ্টা কবিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই। ক্লাসিক কাব্যের নিরন্ধ্র বস্তুবিন্যাস ও বলিষ্ঠ ভাবকল্পনা ইহাতে নাই, রোমান্টিক কবির অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বসিত ভাবালুতা অযথা ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিযাছে। কাব্যকে বৃহদায়তন কবিবার জন্য স্বর্গ হইতে পাতাল পর্যন্ত ইহার ঘটনা স্থান বিস্তৃত করা হইয়াছে,—দুই খণ্ডে চবিবশ সর্গে কাব্য সম্পূর্ণ করা হইয়াছে, কিন্তু ক্লাসিক কাব্যেব প্রস্তর কঠিন ভাব ইহাতে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার কবিলে দেখা যায় কবি স্থানে স্থানে সার্থক সুনির্বাচিত উপমা প্রযোগে স্পষ্ট চিত্রাঙ্কনে সমর্থ হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—কাব্যের সূচনায় বৃত্রাসুব কর্তৃক পবাজিত পাতাল পুরীতে গুপ্তমন্ত্রণারত দেবগণের বর্ণনা হইতে কিছুটা এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

'বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত
মলিন বিবর্ণ যথা সূর্য ত্বিষাম্পতি
বাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;
কিংবা সে রজনীনাথ হেমন্ত নিশিতে
কুজ্ঝটিমণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনুঃ
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে।"

হেমচন্দ্র মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁহার এই কাব্যে ব্যবহার করিতে গিয়াছেন বটে, কিন্তু পারেন নাই। মধুসূদনের ছন্দের বস ধ্বনি ইহাতে নাই। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর মিলহীন পয়ারে পরিণত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র এই কাব্যে মাঝে মাঝে মিত্রাক্ষর প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন ইহার যুদ্ধ বর্ণনায় পাই—

'দ্বিগুণ বিক্রমে এবে দানব আক্রমে দেবে
ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জন ভীষণ,
দেব দৈত্য যুদ্ধারম্ভ আবার ভুবন স্তব্ধ
শূন্য মার্গে অবিরত অস্ত্র সংঘর্ষণ।'

কবি বৃত্রসংহারের কাহিনীটি লইয়াছেন মহাভারতের বনপর্ব হইতে, কিন্তু মূল কাহিনী তিনি যথাযথ অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার কাহিনীর পরিকল্পনা এইরূপ—ইন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়া বৃত্র স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ইন্দ্র কুমেরুশিখরে তপস্যানিরত, শচী মর্তে, দেবতারা পাতালে। অবশেষে একদিন দেবতারা অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এদিকে বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলার ইন্দ্রপত্নী শচীকে দাসী করিবার সাধ। শচীকে আনিতে গিয়া ভীষণাসুর নিহত হইল। পরে বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় শচীকে ধরিয়া আনিল। ইন্দ্র কৈলাসে গিয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলে শিব বৃত্র-নিধনের উপায় বলিয়া দিলেন—

"বদরী আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে, বিষ্ণু আরাধনা করি,
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।'

দধীচি পরার্থে মৃত্যু বরণ করিয়া নিজের অস্থি দিলেন। বিশ্বকর্মা তাহা দিয়া বজ্র নির্মাণ করিলেন। সেই বজ্রে বৃত্রাসুর নিহত হইলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কবি 'আশা কানন' নামে একখানি কাব্য প্রকাশ করেন। কবি লিখিয়াছেন—"মানব জাতির প্রকৃতি-গত প্রবৃত্তি সকলকে

প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য।" মানুষের ভাব, কর্ম, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি রূপকের সাহায্যে ইহাতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছায়াময়ী' ইতালীয় কবি দান্তের 'লা কোম্ মেদিয়া' মহাকাব্যের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

এই সকল ছোট বড় কাব্য ব্যতীত হেমচন্দ্র অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতা লিখিয়াছিলেন। সে গুলি 'কবিতাবলী' (দুই খণ্ড) 'বিবিধ কবিতা' 'চিত্ত বিকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত। হেমচন্দ্রের প্রতিভা এই ধরণের খণ্ড কবিতা রচনাতেই অধিক পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার ছোট কবিতার রচনারীতি ও ভাবমাধুর্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ লজ্জাবতী লতা হইতে কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

ছুঁইও না ছুঁইও না ওটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ করে একধারে আছে সরে
ছুঁইও না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
তরুলতা যত আর চেয়ে দেখ চারিধার
ঘেরে আছে অহঙ্কারে ওটি আছে কোথা।
আহা ওইখানে থাক দিও নাক ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেওনা উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুঁইও না ছুঁইও না ওটি লজ্জাবতী লতা।

প্রকৃতি বর্ণনাতেও কবি যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন—

'আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদী রাশিতে যেন ধৌত ধরাতল।
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কলকল করে ধীরে তরঙ্গিনী জল।'

সাময়িক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া হালকা রসের কবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন হেমচন্দ্র—

'হায় কি হলো—বঙ্গ দর্শন বঙ্কিম দেছে ছেড়ে !
হায় কি হলো—দেশটা গেছে সাপ্তাহিকে জুড়ে !
হায় কি হলো—ভূদেব গেল ছেড়ে গুরুগিরি।
হায় কি হলো—হেম নবীনের নাইকো জারিজুরি !

কোন কোন কবিতায় ব্যঙ্গরসিক মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়—

এসো কে বেড়াতে যাবে শীঘ্র কর সাজ।
ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ।

আলেকজাণ্ডার, পোপ, টেনিসন, ড্রাইডেন প্রভৃতি ইংরেজ কবির কবিতার তিনি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সেক্সপীয়ারের 'টেমপেস্ট' ও 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বন করিয়া তিনি 'নলিনী বসন্ত' এবং রোমিও জুলিয়েট' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কবি শেষের দিকে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, স্পর্শমণি' কবিতায় মানব নয়নের সার্থকতার কথা তাই তিনি এমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র সেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা কাব্যের আধুনিক ধারা অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কাব্য সাধনার পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের মধ্যে নাম করা আর একজন হইতেছেন নবীনচন্দ্র সেন। হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের অল্পকাল পরেই ইঁহার আবির্ভাব। জন্ম চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে। ব্যবহারিক জীবনে ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে আসীন ছিলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশ রঞ্জিনী'র প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। ইহাতে মোট একুশটি রচনা স্থান পায়। আঠারো

হইতে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে কবি এই কবিতাগুলি রচনা করেন। রঙ্গিনীব কবিতাগুলি আত্মকেন্দ্রিক,—রোমান্টিকধর্মী। প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার অনুভূতির তীব্রতা, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ। প্রথম ভাগে সামাজিক সমস্যাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। অবকাশ রঙ্গিনীর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। উহাতে দেখা যায় পরাধীনতার বেদনাই কবি-চিত্তকে পীড়িত করিতেছে—

> "হবে কি সে দিন,—কে করে গণনা,
> সেই দিন দীনা ভারত তনয়
> শিখি রণনীতি, করি বীরপনা,
> রক্তাক্ত শবীরে ফিরিবে আলয়।"

অবকাশ-রঙ্গিনী প্রথম ভাগ রচনার পর নবীনচন্দ্র সাময়িক তাগিদে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'ভারত উচ্ছ্বাস' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। কবির মূল কাব্য প্রেরণার সহিত ইহার কোন যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'পলাশীব যুদ্ধ' রচনার পর নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই কাব্যখানি বাঙালী পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবার প্রথম কারণ ইহার বিষয় নির্বাচন। নবীনচন্দ্রের পূর্ববর্তী আধুনিক কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন পুরাণ ও কল্পনা হইতে,—রঙ্গলাল, মধুসূদন ঐতিহাসিক উপাদান সংযোগে কাব্য নাটক রচনা করিলেও রাজপুত জীবন পরিবেশ বাঙালীর কাছে অনেকটা পৌরাণিক পরিবেশেরই সমান। কিন্তু নবীনচন্দ্রের এই কাব্যে উপাদান সর্বাংশে বাংলার। পলাশীর মাঠ, তাহার আমবন, বাংলার নবাব সিরাজ, রাজা রাজবল্লভ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রাণী ভবানী, সেনাপতি মোহনলাল,— এ সবই বাঙালীর অতি সুপরিচিত। বাংলার মাটিতে বাংলায়

আবিভূ‘ত চরিত্র লইয়া বাঙ্গালীর যে জাতীয় দুর্ভাগ্যের কারণ ঘটিয়া গেল তাহার বিলাপ-কাহিনী কোন বাঙ্গালীর হৃদয় না আকৃষ্ট করে।

এই কাব্যের জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ ইহার বর্ণনাভঙ্গী এবং আবেগময়ী ভাষা। নদীর স্রোতের মত ইহার ভাষা সহজ অথচ তীব্র গতিবেগে কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের বর্ণনায় পাই —

বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরব গর্জনে
সলিল সঞ্চয় করি যায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈল প্রতি তড়িত গমনে।
অথবা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন, দলি গুল্ম লতা বন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।
তেমনি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি এক স্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।

‘পলাশীর যুদ্ধ’ পাঁচ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গে সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির মন্ত্রনা। দ্বিতীয় সর্গে চিন্তাক্লিষ্ট ক্লাইভকে দেবী ব্রিটানিয়ার আশ্বাস দান, তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের পূর্বরাত্রে বিলাসমগ্ন সিরাজের আতঙ্ক এবং ক্লাইভের সংশয়। চতুর্থ সর্গে পলাশীর যুদ্ধ, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং পঞ্চম সর্গে বিজয়ী ইংরেজের উৎসব ও সিরাজের হত্যা।

ইহার পর নবীনচন্দ্র মিশররাজকন্যার জীবননাটকের শেষ অঙ্ক লইয়া ‘ক্লিওপেট্রা’ নামে ক্ষুদ্রায়তন একখানি কাব্য রচনা করেন,—কাব্যখানি ক্ষুদ্র বলিয়া ‘অবকাশ-রঞ্জিনীর’ ২য় ভাগের সঙ্গে উহা যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র তাঁহার আর একখানা উল্লেখযোগ্য কাব্য 'রঙ্গমতী' রচনা করেন। কাহিনীর ঘটনাস্থল রঙ্গমতী অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি। কবি এই কাব্যখানি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—'ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক অক্ষরে, আমার বিপদের স্মৃতি, রোগের যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া এবং শোকের অশ্রু জড়িত রহিয়াছে। 'রঙ্গমতী' আমার জীবনের একটি বিষাদপূর্ণ অঙ্কের ইতিহাস।

'রঙ্গমতী'র কাহিনী এইরূপ—মোগল প্রতিনিধির সন্তান বীরেন্দ্রের জন্ম হয় রাঙ্গামাটির এক বনে। বীরেন্দ্রের জননী সপত্নীর অত্যাচারে এখানে পলাইয়া গিয়াছিলেন। সন্তানকে এক পরিচারকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বীরেন্দ্র-জননী কাশী যাত্রা করেন। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া বীরেন্দ্র শিবাজীর আদর্শ গ্রহণ করেন। যুদ্ধে যাইবার আগে কুসুমিকা নামে একটি মেয়েকে ভালবাসিয়া বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়া যান। যুদ্ধান্তে ক্ষতবিক্ষত দেহে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ঢেঁকি পঞ্চাননের সঙ্গে কুসুমিকার বিবাহ হইতে যাইতেছে,—কুসুমিকা অচেতন। কুসুমিকাকে দেখিবামাত্র ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইয়া তিনি মারা গেলেন। কুসুমিকাও মরিল। এক সন্ন্যাসিনী দাঁড়াইয়া সব কিছু দেখিতেছিলেন। তিনি এইবার একটি মশাল লইয়া ঘরে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিলেন। ইনি আর কেহ নহেন, বীরেন্দ্রের জননী।

কার্যোপলক্ষে নবীনচন্দ্র এক সময় মগধের প্রাচীন স্থান রাজগিরে কিছুকাল অবস্থান করেন। স্থানটি জরাসন্ধের রাজধানী বলিয়া খ্যাত। জরাসন্ধের কথা তাঁহাকে মহাভারতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার পর মহাভারত তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র লইয়া তিনখানি কাব্য রচনা করেন—'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩),

ও 'প্রভাস' (১৮৯৬)। পঞ্চাশ সর্গে গ্রথিত কাব্য তিনটি একই মহাকাব্যের তিনটি অংশমাত্র। এই কাব্যত্রয়ীকে 'ঊনবিংশ শতকের মহাভারত' বলা হয়। ইহাতে মহাভারতের অনেক ঘটনা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখিয়া নবীনচন্দ্র নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তিনটি কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ কবি কর্তৃক মহামানবরূপে কল্পিত। তিনি খণ্ড ছিন্ন ভারতবর্ষকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে চাহিয়া বলিতেছেন—

বাঁধি ধর্ম-নীতি পাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদজ্ঞান করিব রহিত।
এক জাতি, এক ধর্ম,
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নবীনচন্দ্রের মতে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ নয়,—আর্য অনার্যের বিরোধ। শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কামকর্ম ও প্রেমের আদর্শে বিরোধের অবসান ঘটাইয়া আর্য অনার্যের মহাসম্মিলন ঘটাইতে আসিয়াছিলেন। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে বিশ্বমানবতা বোধ কিরূপ প্রচারিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ সুভদ্রা-সুলোচনার কথোপকথন হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সুভদ্রা শিবিরে শিবিরে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে আহতদের শুশ্রূষা করিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া সুলোচনা বলিতেছেন—

'মানিলাম নারীধর্ম আর্তআহতদের সেবা,
কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন ?

সুভদ্রা তাহার উত্তর দিতেছেন—

শত্রু ! শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত ?

রক্তমাংস নাহি কি তাহার ?
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ ?
এক জল, ভিন্ন জলাধার।
শত্রু !—এক ভগবান সর্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্বময় এক অদ্বিতীয়।
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয় ?

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র খৃষ্টের জীবনী লইয়া 'খৃষ্ট' নামক কাব্য রচনা করেন। ইহার পরিচয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন—'মেথু প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ম্য হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম উদ্ধৃত ও কবিতায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম'। ইহার পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধের জীবনী লইয়া 'অভিতাভ' বচনা করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যের জীবনী লইয়া 'অমৃতাভ' রচনা আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্র উপরি-উক্ত কাব্যগুলি ছাড়া ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডের চণ্ডীর পদ্যানুবাদও করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়কর মহা আবির্ভাব। সূর্যকিরণ সম্পাতে যেমন পৃথিবীর পত্র পুষ্প, নদী-তড়াগ, সমুদ্র, শৈলশিখর অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, রবীন্দ্র-প্রতিভা স্পর্শে তেমনি কাব্য, গীতি, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি করিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি অঙ্গ দিব্য বিভায়—সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিভা অবশ্য মানুষের সহজাত, কিন্তু তাহার বিকাশে কার্য করে পরিবেশ। ঊনবিংশ শতকে কলিকাতার যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতের নবীন সংস্কৃতি উদ্ভূত ও প্রসারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যানুরাগী, উদার ধর্মনায়ক মহর্ষি। তাঁহার পুত্রকন্যার কেউ বা ছিলেন কবি, কেউ নাট্যকার, কেউ শিল্পী, কেউ সমাজসেবী। বাড়ীতে সঙ্গীত চর্চারও অভাব ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি বাংলা ভাষায় দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, সঙ্গীতচর্চা করিতেন, তাহা ছাড়া রেখাচিত্র অঙ্কনেও তাঁহার স্বাভাবিক পটুতা ছিল। 'ভারতী' পত্রিকা ইনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী সাহিত্য চর্চা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া ইনি 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথের আর এক অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক রচনা করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীতে নাটক অভিনীত হইত। এক কথায় সে যুগের ঠাকুর বাড়িটাই ছিল একটা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই রবীন্দ্রনাথের বাল্য কৈশোরের শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে নিজেই লিখিয়াছেন—'ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এইছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।' এই হাওয়াতে পরিবর্ধিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা সম্যক স্ফুরণের যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের ভাবুকপ্রকৃতি এবং কবিত্বশক্তি বিকাশের আর এক কারণ তাঁহার পারিবারিক আবেষ্টন। সাধারণ ছেলেদের মত উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন নাই। ইটের দেয়ালঘেরা ঘরের মাঝে ভৃত্যদের শাসনাধীনে তাঁহার দিন কাটিত। শ্যাম নামে এক ভৃত্য তাঁহাকে ঘরের এক নির্দিষ্টকোণে বসাইয়া চারিদিকে খড়ির

দাগ কাটিয়া বলিয়া যাইত,—এই খড়ির গণ্ডীর মধ্যে বসে থাক। খবরদার বাহিরে এস না। গণ্ডীর বাহিরে এলেই বিপদ'। বিপদের আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়াই জানালার ফাঁক দিয়া উন্মুক্ত অবারিত আকাশ আর জানালার নীচে বটের ঝুরি নামানো একটা পুকুরে স্নানার্থীদেব আনাগোনা দেখিয়া মনে মনে নানা কল্পনার জাল বুনিতেন। বহিঃপ্রকৃতি তাঁহাকে হাতছানি দিত, সেই আহ্বানে তাঁহার চিত্ত বাল্যকাল হইতেই কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কবিতা ও গান—রবীন্দ্রনাথ আটবৎসর বয়স হইতে কবিতা লেখা স্বরু করেন। প্রথমে প্রেরণা পান তাঁহার এক ভাগিনেয়র নিকট হইতে। নাম তাঁহার জ্যোতিঃ প্রকাশ। কবিতা লিখিতে শিখিয়াই উহার জন্য তাঁহার এমন নেশা চাপিয়া ছিল যে হাতের কাছে যে কোন কাগজ পাইলেই তিনি উহাতে কবিতা লিখিয়া বসিতেন। বাড়ির এক কর্মচারীর নিকট হইতে নীল কাগজের একখানা খাতা জোগাড় করিয়া অবিলম্বে তিনি উহা কবিতা লিখিয়া ভর্তি করিয়া ফেলিলেন।

ববীন্দ্রনাথেব প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল' ১২৮২ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর'—পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর। ইহার দুই বৎসর পরে কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিলে প্রথম বৎসর হইতেই তিনি উহাতে কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশ করিতে থাকেন। কবির বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। এই বয়সেই তিনি 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়', 'ভানু সিংহের পদাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া ফেলেন।

শিক্ষালাভের জন্য কিছুকাল বিলাতে কাটাইয়া আসিবার পর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই

কাব্যেই প্রথম চোখে পড়ে কবি আপন প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। স্বুর বেদনার—

আকাশের পানে চাই সেই স্বুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে স্বুরগুলি অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া॥

কিন্তু পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ প্রভাত সঙ্গীতেই (১৮৮৩) দেখা যায় কবির মন হইতে বেদনার মেঘ কাটিয়া গিয়া উহা আনন্দের নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যের প্রভাত-উৎসবে আমরা পাই—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
পূরব-মেঘমুখে পড়েছে রবি রেখা,
অরুণ রথচূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব।

পরবর্তী কাব্য গ্রন্থ 'ছবি ও গানে' (১৮৮৪) কবিচিত্ত জগতের সঙ্গে নিবিড় মিলনে আবদ্ধ হইয়া গান গাহিয়া উঠিয়াছে। ইহার পর 'কড়ি ও কোমলে' (১৮৮৬) দেখা যায় ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতি এবং মানবের সুখ দুঃখের মাঝে কবি নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

ইহার পর 'মানসী'তে (১৮৯০) দেখা যায় কবির প্রতিভা প্রায় পূর্ণ বিকসিত। কবির তখন পূর্ণ যৌবন, সুতরাং প্রেমবিষয়ক অনেক কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রকৃতির প্রতি মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে—'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল—প্রকৃতির এ আহ্বান শুধু বধূকে নয় নিখিল মানব সত্তাকে—

ইহার পর প্রকাশিত হয় তাঁহার 'সোনার তরী' (১৮৯৩), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালী' (১৮৯৬)। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন সোনার তরীতে কিছুটা অস্পষ্ট থাকিয়া 'চিত্রা'তে স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। 'কল্পনা'য় (১৯০০) কবি প্রত্যক্ষ লোক হইতে অতীতের ধ্যানলোকে গিয়া উপনীত হইয়াছেন। 'কথা ও কাহিনী'র অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়াছে বৌদ্ধ, শিখ, মহারাষ্ট্র, রাজপুত জীবন ও বাঙলার সামাজিক জীবনের গৌরব ও মহত্ত্বের কাহিনী অবলম্বন করিয়া। কবির দৃষ্টিতে অতীব তুচ্ছ সাধারণ মানুষের মহত্ত্বও ইহাতে ধরা পড়িয়াছে। যেমন পাই আমরা 'পুরাতন ভৃত্য'—কবিতাটিতে। 'ক্ষণিকা'র (১৯০০) ভাব অপূর্ব, রচনারীতি অত্যন্ত সরল,—যেন মুখের সহজ ভাষা। গুরুগম্ভীর ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে অত্যন্ত হালকা ভাবে। যেমন 'কবির বয়স' কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক—
বসে বসে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক।

ইহার পর রচিত 'নৈবেদ্যে'র (১৯০১) কবিতাগুলির অধিকাংশই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। ইহাতে পূর্ণমাত্রায় উপনিষদের প্রভাব। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শিশু'তে শিশু মন লইয়া রচিত কতকগুলি কবিতা

স্থান পায়। এই কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যেন একেবারে শিশু মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহার অন্তর্গত বীরপুরুষ, লুকোচুরি, মাঝি প্রভৃতি কবিতাগুলি অবিস্মরণীয়।

১৯০৭ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মাঝে রবীন্দ্রনাথ খেয়া, গীতাঞ্জলি' গীতিমাল্য ও গীতালি নামে যে চারিখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন উহারা এক পর্যায়ে পড়ে। খেয়ার ভিতরেই দেখা যায় তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবলোক ছাড়িয়া আধ্যাত্মলোকের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। অপর তিনখানিতে দেখা যায় তিনি ধূলা-মাটির বহু উর্ধ্বে এক অরূপ-আধ্যাত্মলোকে বিচরণ করিতেছেন। খেয়া কাব্যে দুই একটি গান আছে, বাকি সব কবিতা,—অপর তিনখানি কাব্যের প্রায় সবগুলিই গান। গীতাঞ্জলি ও অন্য কাব্য হইতে কতকগুলি কবিতা সংকলন করিয়া—Song offerings নামে ইংরাজীতে রূপান্তরিত করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

গীতালির পর হইতেই রবীন্দ্রকাব্য দিক্ পরিবর্তন করিল। নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া মনুষ্য জীবনকে তিনি নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখিতে লাগিলেন। বুঝিলেন গতি-ই জীবন। 'বলাকা' (১৯২৬) ও 'পলাতকা'তে (১৯২৮) তাঁহার এই নূতন জীবনদর্শন প্রতিফলিত হইয়াছে। 'পূরবী'তে (১৯২৫) কবির জীবন সায়াহ্নের রাগিনী বাজিয়া উঠিয়াছে। কবি অসীম মর্ত-প্রীতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাই 'মহুয়া'তে (১৯২৯) দেখা যায় আধ্যাত্মিকতা, অরূপলোক, গতিদর্শনের রাজ্য ছাড়িয়া তিনি এই পৃথিবীর মাটি ও মানুষের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন—

'নিত্যকালের মায়াবী আসিয়াছে নব পরিচয় দিতে।
নবীনরূপের অপরূপ জাদু আনিবে সে ধরণীতে!'

উল্লেখিত কাব্যগ্রন্থগুলি ছাড়া তিনি শিশুভোলানাথ, বনবাণী, পুনশ্চ, পত্রপুট, শ্যামলী, বীথিকা, খাপছাড়া, প্রান্তিক, সেঁজুতি, নবজাতক, সানাই, রোগ শয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে প্রভৃতি আরও অনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও এই মহা কবি—'দুঃখের আঁধার রাত্রি' এবং 'তোমার সৃষ্টির পথ' নামক দুইটি অতি উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা যেন তাঁহার Swan Song। শেষের দিকে তিনি এক নূতন ধাঁচে কবিতা লিখিয়াছিলেন,—ইহা হইতেছে গদ্য-কবিতা। একটু দৃষ্টান্ত—

'দোতালার জানালা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোনা।
ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল।
জলে গাছের—গভীর ছায়া টলটল করছে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কলমিশাক আর হেলঞ্চ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বড় কবি নন, সঙ্গীত রচনায়ও তিনি অদ্বিতীয়। প্রকৃতি, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও স্বদেশ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি প্রায় তিন সহস্র সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সে সব গানের কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে তাঁহার কোন কোন কবিতা গ্রন্থে,—সবগুলি স্থান পাইয়াছে তিন খণ্ড 'গীতবিতান'-এ। তাহার গানের ভাষা ও সুর শ্রোতাকে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যায়।

ছোট গল্প—বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সার্থক ছোট গল্পের দিক দিয়াও রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোট গল্পের প্রবর্তক। তাঁহার পূর্বে বঙ্কিম, সঞ্জীব প্রভৃতি দুই একজন সাহিত্যিক ছোট গল্প লিখিয়াছেন বটে,—কিন্তু সেগুলি সত্যকার

ছোট গল্প নয়,—ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস। সোনার তরী ও চিত্রা লিখিবার সময় পদ্মার দুইতীরে দৃষ্ট মানুষ ও প্রকৃতি তাঁহাকে ছোট গল্প রচনায় প্রেরণা দেয়। তখন হইতে সুরু করিয়া মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি অজস্র ছোট গল্প লিখিয়াছেন। এগুলি তাঁহার তিন খণ্ড 'গল্পগুচ্ছ' 'গল্পসল্প', 'তিনসঙ্গী', 'সে' প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বিষয় বস্তুও বিচিত্র : সমাজের নানা চিত্র—যেমন দেনাপাওনা, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি গল্পে, ; অতি প্রাকৃত ঘটনা—যেমন ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল প্রভৃতি গল্পে, প্রেম, স্নেহ, হাসিকান্না—যেমন দুরাশা, পোস্টমাস্টার, ছুটি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, কাবুলীওয়ালা প্রভৃতি গল্পে। সার্বজনীন আবেদনশীল তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্প বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প রচয়িতাদের অন্যতম।

উপন্যাস—বাংলা উপন্যাস রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কি সাময়িক রাজনৈতিক সমস্যা, কি মানুষের মন, রবীন্দ্রনাথ সবকিছুরই গভীরে প্রবেশ করিয়া উহার যথাযথ রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যে বাস্তবতার সূচনাও তিনিই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রথম দুইখানি উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮২) ও 'রাজর্ষি'কে (১৮৮৫) ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে। তৃতীয় উপন্যাস 'চোখের বালিতে, (১৯০২) আছে চিত্তবৃত্তির ঘাত প্রতিঘাত। বাংলা সাহিত্যে এইটিই প্রথম 'মনস্তাত্ত্বিক' উপন্যাস। পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) ঘটনা বহুল। 'গোরা' (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহার পরে রচিত 'চতুরঙ্গ' (১৯১৪), 'ঘরে বাহিরে' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের' কবিতা (১৯২৯), 'দুই বোন' (১৯৩৩),

'মালঞ্চ' (১৯৩৪) ও 'চার অধ্যায় (১৯৩৪) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র এবং বিশিষ্ট চিন্তাব স্বাক্ষর বহন করে।

নাটক—নাট্য সাহিত্যেও ববীন্দ্রনাথের দান বড় কম নহে। জীবনে তিনি ছোটবড প্রায় চল্লিশখানি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার নাট্য রচনাকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়, যেমন গীতিনাটক, নাট্য কাব্য ও কবিতা, রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক, সামাজিক নাটক, ঋতু নাট্য, রঙ্গ-নাট্য, নৃত্য নাট্য ইত্যাদি।

প্রথমবাব বিলাতে গিয়া সেখানকার গৃহস্থ পরিবারে গীত অভিনয় দেখিয়া আসিয়া নিজেদেব পরিবাবেও উহা প্রবর্তন করিতে তিনি ইচ্ছুক হ'ন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) রচনা করিয়া বাড়ির ছেলেমেয়েদের সহিত নিজেও অভিনয় করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পদ্যেব সহিত কিছু গদ্য মিশাইয়া তাঁহার প্রথম নাটক 'রাজা ও রাণী' রচনা করেন। ইহারই বিষয় বস্তু অবলম্বনে শেষ বয়সে তিনি 'তপতী' (১৯৩০) লেখেন।

পববর্তী নাটক বিসর্জনের (১৮৯০) বিষয়বস্তু তাঁহার উপন্যাস রাজর্ষি হইতে লওয়া। নাটকটি অধিকাংশই গদ্যে লেখা। 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) ও 'মালিনী' (১৮৯৬) দুইখানিই কাব্যরসাশ্রিত। মালিনীর কাহিনী অংশতঃ বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে পাওয়া, বাকি স্বপ্নলব্ধ। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদ' এবং ১৮৯৭-এ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' লেখেন। এই দুইখানিই প্রহসন। পর বৎসর তিনি শান্তি নিকেতনের বালক ছাত্রদের অভিনয়োপযোগী একখানা গীতিনাট্য লেখেন,—নাম 'শারদোৎসব'।

ইহার পরের নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) তাঁহার স্বরচিত উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর বিষয়বস্তু অবলম্বনে লেখা। পরবর্তী নাটক

'রাজা'র (১৯১০) কাহিনী বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে লওয়া। 'অচলায়তন' (১৯১১) বৌদ্ধধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, এবং 'ডাকঘর' (১৯১২) রূপকাশ্রিত।

ইহার পরে রচিত নাটকগুলির নাম 'মুক্তধারা' (১৯১২) 'রক্তকরবী' (১৯২৪) 'শোধবোধ' (১৯২২) 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫) ও 'বাঁশরী' (১৯৩৩)। গীতি-নাট্য ও নৃত্য-নাট্যের নাম 'ফাল্গুনী' (১৯১৫) 'নটীর' পূজা' (১৯২৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩)। মুক্তধারায় পাশ্চাত্য সভ্যতার হৃদয়হীন বণিকবুদ্ধির স্বরূপ উদঘাটন করা হইয়াছে। রক্তকরবীতে দেখানো হইয়াছে যান্ত্রিক সভ্যতার কুৎসিত দিকটার ভয়াবহ পরিণাম।

'গান্ধারীর আবেদন',—'কর্ণকুন্তী সংবাদ'—'কচ ও দেবযানী' প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে নাটকীয় 'ঘাত প্রতিঘাত' পূর্ণমাত্রায় থাকায় এগুলি কবিতা হইয়াও নাট্য গৌরব লাভ করিয়াছে।

সাধারণ লোক রবীন্দ্র নাট্য রস হয়ত পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারে না,—ইহার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত রুচিশীল মন।

বিবিধ গদ্য রচনা—নানা জাতীয় প্রবন্ধ রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় যখন তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ—'তিনটি সমসাময়িক গীতিকাব্যের সমালোচনা' বাহির হয় তখন তাঁহার বয়স মাত্র পনের বৎসর। তাহার পর তিনি নানা বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে পড়ে ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা, রাষ্ট্রীয় সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, সাহিত্য সমালোচনা, শিক্ষা সমালোচনা, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র, ডায়েরি, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি।

'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' ইত্যাদি গ্রন্থে

সাহিত্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি নানারূপ বিচার বিশ্লেষণ আলোচনা করিয়াছেন। 'আধুনিক সাহিত্যে', তৎকালীন সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উদঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে' রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, কুমার সম্ভব, মেঘদূত ইত্যাদি লইয়া এমন আলোচনা করিয়াছেন যে তাহাতে এক নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এ দুইটি সাহিত্যের সমালোচনা। 'লোক সাহিত্যে' তিনি ছেলে ভুলানোর ছড়া ও লোক সঙ্গীতের রসমধুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাঁহার অন্য প্রবন্ধপুস্তক 'শিক্ষা', 'ধর্ম', 'সমাজ', 'স্বদেশ' 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'পঞ্চভূত' ইত্যাদিতে তাঁহার গভীর জ্ঞান, পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা, সহৃদয়তা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যে সব কিছুই মনোরম।

'বিশ্বপরিচয়' নাম দিয়া ছেলেদের উপযোগী করিয়া তিনি বিজ্ঞান গ্রন্থ লিখিয়াছেন—তাহাও অভূতপূর্ব। তাঁহার লিখিত ডায়েরি, চিঠিপত্র সব কিছুই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সবের অনেকগুলি 'ছিন্নপত্র', 'পথের প্রান্তে', 'ভানু সিংহের পদাবলী', 'রাশিয়ার চিঠি'—ইত্যাদি গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। বিশ্বের নানা স্থানে তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়া রচিত হইয়াছে—'যাত্রী', 'জাপান যাত্রী', 'পথের সঞ্চয়' এবং পূর্বোল্লিখিত 'রাশিয়ার চিঠি'। জীবন কথা লইয়াও তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নিজের জীবন কথা লইয়া রচিত 'জীবন স্মৃতি' এক অপূর্ব গ্রন্থ। ইহা ছাড়া 'চরিত্রপূজা' গ্রন্থে তিনি কয়েকজন মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার গদ্য রচনা সর্বত্রই গভীর অনুভূতি এবং প্রকাশ ভঙ্গির মাধুর্যে অপরূপ। বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত য়ুরোপ যাত্রীর

ডায়েরির খসড়া হইতে তাঁহার অপূর্ব গদ্য রচনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো যাইতেছে—

"চমৎকার লাগচে—উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। এক রকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূব হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ—আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী অপরিচিত বিস্মৃত নিভৃত ছায়াস্নিগ্ধ, নদীকলধ্বনিসুপ্ত বাঙ্গালা দেশ—আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, আমার ভালবাসালালায়িত কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, আমার নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাশীল অতিব্যথিত জীবন-স্মৃতি এই সূর্যকিরণে এই তপ্ত বায়ু হিল্লোল সুদূর মরীচিকার মত আমার স্বপ্নভারনত দৃষ্টির সামনে জেগে উঠেছে। আমি প্রাচ্য, আমি এশিয়াবাসী, আমি বাঙ্গালার সন্তান; আমার কাছে য়ুরোপীয় সভ্যতা মিথ্যে—আমাকে একটি নদীতীরে—একটি দিগন্ত বেষ্টিত কনক-সূর্যাস্তরঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, একটুখানি বিজনতা, খ্যাতি প্রতিপত্তিহীন প্রচেষ্টাবিহীন নিরীহ জীবন, এবং যথার্থ নির্জনতাপ্রিয় একাগ্রগভীর ভালবাসাপূর্ণ একটি হৃদয় দাও—আমি জগদ্বিখ্যাত সভ্যতার গৌরব, উদ্দাম জীবনের উন্মাদ আবর্ত; এবং অপর্যাপ্ত যৌবনের প্রবল উত্তেজনা চাই নে।"

———

অনুশীলনী

প্রথম খণ্ড

১। বাংলা ভাষার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। মঙ্গল কাব্য কাহাকে বলে ?

৪। বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের মধ্যে কি সাদৃশ্য লক্ষিত হয় ?

৫। নিম্নলিখিত মঙ্গল কাব্যগুলির কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল, ধর্ম মঙ্গল।

৬। বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের প্রসিদ্ধ কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৮। কবি কৃত্তিবাস ও অন্যান্য বাংলা রামায়ণরচয়িতার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৯। কাশীরাম দাস ও অন্যান্য বাংলা মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১০। সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কথা বিবৃত কর।

১১। চৈতন্য জীবনীকারদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১২। গীতি সাহিত্য কাহাকে বলে ? উহার বিভিন্ন ধারার পরিচয় দাও।

১৩। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৪। কয়েকজন প্রসিদ্ধ পদকর্তার রচনা উদ্ধৃত করিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৫। কয়েকজন বিখ্যাত শাক্তপদ রচয়িতার নামের সহিত উহাদের রচনা উদ্ধৃত করিয়া শাক্তপদ মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা কর।

১৬। আগমনী-বিজয়া গানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় খণ্ড

১। বাংলা গদ্য সৃষ্টি ব্যাপারে ইউরোপীয় মিশনারীগণ কি কি করিয়াছেন আলোচনা কর।

২। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা কর।

৩। বাংলা গদ্য রচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কি ভূমিকা গ্রহণ করে?

৪। বাংলা সাময়িক পত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

৫। বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র যাহা করিয়াছেন আলোচনা কর।

৬। বাংলার কবিগান ও পাঁচালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। বাংলা নাট্যশালার উদ্ভবের ইতিহাস লিখ।

৮। নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিচয় প্রদান কর;

৯। ছোট গল্প ও উপন্যাসের লক্ষণ আলোচনা কর।

১০। বাংলা ছোট গল্প ও উপন্যাসের উদ্ভব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১১। ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমের প্রতিভার পরিচয় দাও।

১২। বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের কি দান?

১৩। ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার হিসাবে প্রভাতকুমারের পরিচয় দাও।

১৪। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এত জনপ্রিয় কেন?

১৫। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা কর।

১৬। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিহারীলালের কবিকৃতির উপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা কর।

১৭। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কি কি দান করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৮। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।